বার্ষিক সাময়িকী

প্রবাল

বত্রিশতম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৭

প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবাল

বার্ষিক সাময়িকী
৩২তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন

সম্পাদক

প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম

সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. মো. গোলাম মোর্তুজা
ড. মো. ফজলুল হক
ড. শারমিন মুস্তারী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

সম্পাদক, প্রবাল

ফটোগ্রাফি

ড. ইশতিয়াক মাহফুজ ও ড. মো. ফজলুল হক

কম্পোজ ও মুদ্রণ

ইকরা প্রিন্টিং প্রেস, কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
টেলিফোন: ০৭২১-৭৫১১০৯, সেলফোন: ০১৭১৪-৩৩৪৩৮৮

© প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মিউজিয়াম উদ্বোধন ও প্রদর্শনী
অনুষ্ঠানের বক্তৃতা পর্ব

মিউজিয়াম উদ্বোধন ও প্রদর্শনী
অনুষ্ঠানে উপস্থিত
সুধিমন্ডলীর একাংশ

মিউজিয়াম প্রদর্শনীতে
অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

প্রবাল ৩২তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৭

সূচীপত্র

মরহুম প্রফেসর ড. সায়ীদুর রহমান (১৯৩৭-২০১৭) : জীবন ও কর্ম	৩-৪
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের পরিচিতি	৫-৭
বিবর্তনের পথে –*ইশরাত জাহান খান চৌধুরী ঈশিতা*	৮-১০
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় : পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি ধ্বস –*মো. আলমগীর*	১০-১১
তথ্য কণিকা ১ বিপন্নপ্রায় পদ্মার ঘড়িয়াল –*আসাদ-উল্লাহ চৌধুরী*	১২
তথ্য কণিকা ২ ডোডো রহস্য –*আসাদ-উল্লাহ চৌধুরী ও মোহাম্মদ সুমন*	১৩
Some extraordinary jellyfishes –*Md. Badsha Alam*	১৪-১৭
তথ্য কণিকা ৩ ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস *(Erythroblastosis foetalis)* –*ড. শারমিন মুস্তারী*	১৭
রাজশাহী জেলায় দেখা কয়েকটি বিপদাপন্ন পাখি –*প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন ও প্রফেসর ড. এ. এম. সালেহ রেজা*	১৮-২০
প্রাণিবিদ্যা বিভাগে খেলাধূলা –*ড. ইসতিয়াক মাহ্‌ফুজ*	২১
মানব হিমোগ্লোবিনের বংশগতি –*প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম*	২২-২৬
আবাস ভেদে তিনটি পাখি –*প্রফেসর ড. এ. এম. সালেহ রেজা ও প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন*	২৭-৩০
আশ্চর্য প্রাণী টিউবওয়ার্ম –*তৌকির মাহমুদ আসিফ*	৩১
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় : হাওড় অঞ্চলের বন্যা –*মো. আলমগীর*	৩২
জুওলজিরই যন্ত্রণায়!! –*মো. মোখলেসুর রহমান*	৩৩
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর –*মো. ফিরোজ সরকার*	৩৪
বন্যা নয়, জিতবে এবার মানবতা –*মো. আব্দুল মোমিন প্রামাণিক*	৩৫
পারমাণবিক বিপর্যয় ও মানুষের উপর এর প্রভাব –*মো. রুহুল আমিন*	৩৬-৩৭
কর্ম উন্নয়ন ও গভর্ন্যান্স প্রকল্পে আইসিটি এর কৌশলগত প্রয়োগ : একটি প্রশিক্ষণ কোর্স –*ড. মো. ফজলুল হক ও নাজমুল হক*	৩৫
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-এর জন্য প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি: -এর তথ্য-উপাত্ত সংযোজন	৩৯-৪১
বি.এস-সি (সম্মান) ৪৭তম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের শিাসফর ২০১৭ –*প্রফেসর ড. মো. গোলাম মোর্ত্তুজা ও ড. মো. আরিফুল হাসান*	৪২-৪৩
Neuroscience Meeting and Symposium at Chicago –*Mohammad Abdullah*	৪৩
অস্তিত্বের প্রশ্নে যখন জীবন –*প্রফেসর ড. মো. নূরুল ইসলাম*	৪৪-৪৮
প্রাণ সাম্রাজ্যের পাঁচালি নাটিকা –*প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র দাস*	৪৯-৫১
প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়াম : সাম্প্রতিক অগ্রগতি –*ড. আঞ্জুমান আরা আলী*	৫২-৫৪
প্রথম বর্ষ (সম্মান) ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ৪৭তম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিতি	৫৫-৫৬

মরহুম প্রফেসর ড. সায়ীদুর রহমান (১৯৩৭-২০১৭) : জীবন ও কর্ম

[প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা.বি-র অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রফেসর ড. সায়ীদুর রহমান গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি...)। তিনি ছিলেন শিক্ষার্থীদের অতি প্রিয় এবং সফল একজন শিক্ষক। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে এখানে মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম প্রকাশ করা হলো। -বি. স.]

১. জন্ম ও পরিবার

জন্ম	: ১লা জানুয়ারি ১৯৩৭।
জন্মস্থান	: মহারাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
পিতা	: মরহুম মৌলভী মহিউদ্দীন আহমেদ।
মাতা	: মরহুমা বেগম মৌলুদ মহল।
ভাইবোন	: মোট ৫ ভাই বোন, অগ্রজ ২ বোন ও অনুজ ১ বোন ও এক ভাই।
সহধর্মিণী	: মিসেস তসলিমা বেগম, বিবাহ তারিখ ২৩ জুন ১৯৬৩।
সন্তান-সন্ততি	: তিন কন্যা ও এক পুত্র: তানজিমা তাহমিন (নীতা), সাকসিনা তাহমিন (লীনা), আসেক আহমেদ সাঈদ (প্রান্ত) এবং মৌরিনা তাহমিন (নীপা)।

২. শিক্ষা

মেট্রিকুলেশন	: ১৯৫২, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী।
আই.এস-সি	: ১৯৫৪, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
বি.এস-সি	: (প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যা), ১৯৫৮, রাজশাহী কলেজ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
এম.এস-সি	: (প্রিলিমিনারি) ১৯৫৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আবাসিক হল: ফজলুল হক মুসলিম হল)।
এম.এস-সি	: ফাইনাল (শাখা প্রাণিকোষতত্ত্ব), ১৯৬০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আবাসিক হল: ফজলুল হক মুসলিম হল) [সতীর্থ প্রফেসর ড. হুমায়ুন কবীর, মরহুমা প্রফেসর ড. আনোয়ারা কবীর এবং প্রফেসর ড. এ.কে.এম. বশিরউল্লাহ]।
পি-এইচ.ডি	: ১৯৮৫, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। থিসিসের বিষয়: Eri Silkworm-এর কৌলিতত্ত্ব)।

৩. চাকুরি

বায়োলজিস্ট	: ১৯৬০ থেকে ১৯৬১, পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য বিভাগ (ঢাকা)।
প্রভাষক	: ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
সহকারী অধ্যাপক	: ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
সহকারী অধ্যাপক	: ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৬, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি:।
সহযোগী অধ্যাপক	: ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি:।
প্রফেসর	: ১৯৯১ থেকে ২০০১, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি:।
খণ্ডকালীন শিক্ষক	: প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ এবং জেনেটিক ব্রিডিং বিভাগ; রা: বি:।

৪. গবেষণা

গবেষণার বিষয়	: প্রধানত সাইটোলজি, সাইটোজেনেটিক্স ও জেনেটিক্স।
প্রকাশনা	: সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি, তবে ৩০টির মতো হতে পারে।
গবেষণা কর্ম তত্ত্বাবধান	: পি-এইচ.ডি থিসিস ২টি, এম.ফিল থিসিস ৩টি এবং অনেকগুলো এম.এস-সি থিসিস।

বায়োলজিস্ট : ইউনিসেফ/ইউনেস্কোর প্রকল্প, শিক্ষা অধিদপ্তর (১৯৬৬)।
রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর : ফুড, ফুয়েল ও ফাইবার প্রকল্প, রা: বি:।
বিশেষজ্ঞ : সার্ক টেকনিক্যাল কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন (১৯৮৯)।

৫. বিদেশে একাডেমিক সফর

যুক্তরাজ্য : ভিজিটিং ফেলো, নিউক্যাসল আপন-টাইন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯১)।
ভারত : নয়াদিল্লিতে পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণ (১৯৯৫)।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য পদ

সভাপতি : প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি: ১৯৮৩–১৯৮৪ (ভারপ্রাপ্ত), ১৯৮৪–১৯৮৮।
ডীন : জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদ, রা: বি: ১৯৯৫–১৯৯৬।
সহ-সভাপতি : রা: বি: ক্লাব।
সিনেট সদস্য : সিনেট সদস্য, রা: বি: ১৯৮৪–১৯৮৮।

৭. সম্মাননা ও লার্নেড সোসাইটির সদস্য

ফেলো : বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি।
জীবন সদস্য : বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি।
সদস্য : বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি।

৮. শিক্ষাতিরিক্ত কার্যক্রম

ক্রীড়া : রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃকক্ষ টেবিল টেনিস ও ব্রিজ প্রতিযোগিতায় কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন।
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড : সঙ্গীত, নাটক ও আবৃত্তির একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক।
কথক : বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রের জীববিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ক একজন নিয়মিত কথক।
জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ : প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বার্ষিক সাময়িকী প্রবালসহ অন্যান্য পত্রিকায় জনপ্রিয় প্রবন্ধ লেখক।

৯. মৃত্যু : ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৭।

(তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপনা: প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র দাস)

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের পরিচিতি

কর্মরত প্রফেসরবৃন্দ

এম. খালেকুজ্জামান (১৯৭৬-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), ফেলো, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, ফেলো, রয়াল কীটতত্ব সমিতি (লন্ডন), পোস্ট-ডক্টোরাল ভিজিটর ও কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলো (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি: (১৯৯৩-৯৪; ১৯৯৫-৯৮); প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর (১৯৯৯-২০০২); পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, রা: বি: (২০০৯-১১); জীবপরিসংখ্যান, বাস্তুবিদ্যা ও ক্রপ প্রোটেকশন; টেলিফোন: ৭৬০০০৪; রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।

এ. এস. এম. শফীকুর রহমান (১৯৮১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), এম. ফিল (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পি-এইচ. ডি (রা: বি:), প্রশাসক, বৈজ্ঞানিক ওয়ার্কশপ, রা: বি: (২০০৫-০৬), সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি: (২০১৩-১৫); অমেরুদন্ডি প্রাণী, কীট অঙ্গসংস্থান, শস্য পোকার বিষক্রিয়া অধ্যয়ন; টেলিফোন: ৭৫০৩৮৮; রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।

সেলিনা পারভীন (১৯৮৩-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, এম. ফিল (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলো (নিউক্যাসল-আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), ফেলো, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, জীবন সদস্য, বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি, প্রাধ্যক্ষ, মন্নুজান হল, রা: বি: (১৯৯১-৯২), সভাপতি, ফিশারিজ বিভাগ, রা: বি: (১৯৯৯-২০০১), সিনেটর, রা: বি: (২০০৪-০৮), ভিজিটিং স্টাফ ফেলোশিপ (ইউ.এস. স্টেট ডিপার্টমেন্ট, নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়), সদস্য, রয়াল সোসাইটি ফর প্রোটেকশন অব বার্ডস, যুক্তরাজ্য, জীবন সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, সিন্ডিকেট সদস্য, রা: বি: (২০১৪-১৬), এলামনাই সদস্য, RUZDAA নিউক্যাসল আপন-টাইন বিশ্ববিদ্যালয়,যুক্তরাজ্য, নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়, ওমাহা, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও কমনওয়েলথ কাউন্সিল, খন্ডকালীন ইউজিসি সদস্য (২০১৫-১৭), সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি: (২০১৫-); প্রাণী আচরণ ও এথিক্স, মৎস্য বায়োলজি ও অর্থনীতি; গুদামজাত শস্যের কীট প্রতিরোধ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, পাখির প্রজাতি বৈচিত্র্য, বাস্তুসংস্থান ও আচরণ অধ্যয়ন; টেলিফোন: ৭৭৩১২২; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

এম. সাইফুল ইসলাম (১৯৮৩-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), এম. এস-সি (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পি-এইচ. ডি (রেডিং, যুক্তরাজ্য), কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলো (অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য), ভিজিটিং ফেলো (কেন্টাকী, যুক্তরাস্ট্র), প্রাক্তন ফেলো, রয়াল কীটতত্ব সমিতি (লন্ডন), ফেলো, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, আঞ্চলিক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি (২০০৫-০৬), জীবন সদস্য, বাংলাদেশ জীনতত্ব সমিতি, বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি ও বাংলা একাডেমি, প্রাক্তন সদস্য, আমেরিকা বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি, জীবপরিসংখ্যান, আপদ প্রাণীর জীনতাত্বিক নিয়ন্ত্রণ, গবাদি পশুর পরিমানগত বৈশিষ্ট্য ও মানব জীনতত্ব অধ্যয়ন; টেলিফোন: ৭৫০৪৫১; রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ।

বিধান চন্দ্র দাস (১৯৮৯-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (কল্যাণী, ভারত), কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো (নরউইচ), যুক্তরাজ্য), ভিজিটিং ফেলো (ব্যঙ্গুর, যুক্তরাজ্য), লিংক কোর্ডিনেটর, দ্বিপাক্ষিক (যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ, ২০০৮-২০১০, জার্মানি-বাংলাদেশ, ২০১৩-২০১৬), বহুপাক্ষিক (যুক্তরাজ্য-ঘানা-বাংলাদেশ, ২০০৯-২০১২), প্রশাসক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রা. বি. (২০১০-২০১৩), কলেজ পরিদর্শক, রা.বি. (২০১৩-২০১৭), ফেলো, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশে বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি, বাংলা একাডেমী, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, এ্যাফিডোলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, কনজারভেশন বায়োলজি ও ক্লাইমেট চেঞ্জ, আইপিএম, সিস্টেমেটিকস। টেলিফোন: ৭৫০৩১০; রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।

মো. মাহবুব হাসান (১৯৮৯-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (বার্লিন, জার্মানি), ভিজিটিং ফেলো (সুকুবা, জাপান), ভিজিটিং ফেলো (ক্যান্সাস, যুক্তরাস্ট্র), সাধারণ সম্পাদক, রা: বি: শিক্ষক সমিতি (২০০৬-০৮); অমেরুদন্ডি গঠন ও কার্যকারীতা, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বায়োলজি ও গুদামজাত পণ্য সংরক্ষণ কৌশল। টেলিফোন: ৭৫০৬৭২; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ।

এম. নজরুল ইসলাম (১৯৯১-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), এম. ফিল (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পি-এইচ. ডি (রা: বি:), সিন্ডিকেট সদস্য, রা: বি: (১৯৯৯-২০০০), রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), রা: বি: (২০১৩); জুকিপিং, ফিশারিজ ও ম্যালাকোলজি। সেলফোন: ০১৭১২ ১৯৩০৫৫; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

মো. হাবীবুর রহমান (১৯৯১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (ইহিমে, জাপান), এসটিএ পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (ইহিমে, জাপান), পোস্ট-ডক্টোরাল রিসার্চ (National Research Institute of Aquaculture, জাপান ২০০৪-০৮), ভিজিটিং প্রফেসর (ইবারাকি, জাপান (২০১০-১২), সিনেটর, রা: বি: (২০১৬-বর্তমান), Section Reviewer (Frontier Microbiology & Chemotherapy), জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, সদস্য, বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি, মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি ও প্যারাসাইটোলজি, প্রাণী পরিচিতি ও শ্রেণীবিন্যাসতত্ব, মাছের রোগ, বাস্তুতন্ত্র ও পুকুর ব্যবস্থাপনা। টেলিফোন: ৭৫১১১৩; রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ।

মো. সাইফুল ইসলাম ফারুকী (১৯৯৪-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), জেএসপিএস পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (সুকুবা, জাপান), সিন্ডিকেট সদস্য, রা: বি: (১৯৯৭-১৯৯৮), প্রাধ্যক্ষ, শহীদ হবিবুর রহমান হল, রা: বি: (২০০৮-০৯), ডীন, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদ, রা: বি: (২০১৬-), জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি, প্রাণীর গঠন ও কার্যকারীতা, আপদ প্রাণীর ব্যবস্থাপনা, গুদামজাত পণ্য সংরক্ষণ কৌশল ও সমন্বিত বালাই দমন। টেলিফোন: ৭৫১১৮৩; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ।

মোহা. মাইনুল হক (১৯৯৪-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), জেএসপিএস পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (জাপান), প্রশাসক, কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া, রা: বি: (২০১২-১৪), প্রশাসক, পরিবহন, রা: বি: (২০১৫-১৭), বাস্তুতত্ব, মাকড়তত্ব ও জীব শ্রেণীবিন্যাসতত্ব। টেলিফোন: ৭১১৯১৭; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ।

মো. গোলাম মোর্তুজা (১৯৯৪-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, এম. ফিল (রা: বি:), ডি. এস-সি (হিরোশিমা, জাপান), প্রাধ্যক্ষ, আমীর আলী হল, রা: বি:, পোস্টড-ক্টোরাল পজিশন (পুশান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, দ: কোরিয়া), প্রফেসর (কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব); ফিশারিজ বায়োলজি ও ব্যবস্থাপনা এবং ফ্লাড প্লেইন ফিশারিজ। টেলিফোন: ৭৫০৪৮১; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

আমিনুজ্জামান মো. সালেহ রেজা (১৯৯৭-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), জেএসপিএস পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (সুকুবা, জাপান), বায়োইনফর্মেটিক্স, হেল্‌থ বায়োলজি, রেশম জীনতত্ব ও মলিকিউলার বায়োলজি, পাখির বাস্তুসংস্থান ও আচরণ অধ্যয়ন। টেলিফোন: ৭৫১৪৭১; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

রেজিনা লাজ (১৯৯৭-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), প্রাধ্যক্ষ, মন্নুজান হল, রা: বি: (২০০৭-২০০৯), প্রাণীর প্রটেকশন, সাপোর্ট ও মুভমেন্ট, ইমিউনোজেনেটিক্স ও জীন প্রকৌশল, রেশমের জীনতত্ব ও আপদ পতঙ্গের জীনতাত্বিক দমন কৌশল। সেলফোন: ৭৫০৬২৪; রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।

মো. নূরুল ইসলাম (১৯৯৭-) বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), এসটিএ পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (আওমোরি গ্রীনবায়োসেন্টার, জাপান), পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (লোজান, সুইজারল্যান্ড); জীবন সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি, সদস্য, বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, সদস্য, আমেরিকান সোসাইটি অব ফার্মাকগনেসি, সদস্য, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব ফাইটোকেমিস্ট্রি, সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাচারাল প্রোডাক্টস, সদস্য, প্লান্ট ডিজিজ বায়োকন্ট্রোল এ্যান্ড বায়োটেকনোলজি সোসাইটি, জাপান; খন্ডকালীন শিক্ষক, জাপানী ভাষা কোর্স, রা: বি:, রোভার স্কাউট লিডার, রা: বি:, ক্রপ প্রোটেকশন ও জীবতাত্বিকভাবে সক্রিয় প্রাকৃতিক উপাদানের ইকোলজি। টেলিফোন: ৭৫০০৯৭; রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ।

নুজহাত আরা (১৯৯৭-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), এম. এস-সি (ঘেন্ট, বেলজিয়াম), রিসার্চ ফেলো (ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাস্ট্র); অমেরুদন্ডি প্রাণীর গঠন ও কার্যকারীতা ও কীটতত্ব। টেলিফোন: ৭৫০৩৩৪; রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।

মো. কামরুল আহসান (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), রেশম বিশেষজ্ঞ, রেশম প্রজনন ও জীনতত্ব। সেলফোন: ০১৭১৬ ৪০৮১৭৪; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ ।

মো. মনিরুজ্জামান সরকার (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:), ভিজিটিং ফেলো (রিউকুস, জাপান), সদস্য, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, বাস্তুতত্ব, ভ্রুণতত্ব ও ম্যালাকোলজি। সেলফোন: ০১৮১৪ ৯৭৮৪১০; রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ।

মো. আনিছুর রহমান (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (গিফু, জাপান), জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি। সেলফোন: ০১৭১২ ১৪১১৭৩; রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ।

কর্মরত সহযোগী প্রফেসরবৃন্দ

সাবিনা সুলতানা (২০০৬-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:); ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট, এ্যাকুয়াকালচার, ফিশ মার্কেটিং, জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অধ্যয়ন এবং ফিশ লিমনোলজি। সেলফোন: ০১৭১৬ ৪৩৯২০৫; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ।

শাহ্ হোসাইন আহমদ মেহ্দী (২০০৬-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (রিউকুস, জাপান), পোস্ট-ডক্টোরাল ভিজিট (পিকিং, চীন); মেরুদন্ডি প্রাণীর গঠন ও কার্যকারীতা ও ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ক্রুপ প্রোটেকশন ও টক্সিকোলজি, খামার ও গবেষণাগার প্রাণী, প্রজাপতির মলিকিউলার ফিজিওলজি ও বিবর্তন, ক্যান্সার কোষ। সেলফোন: ০১৯১০ ৭৩৭৩৫০; রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।

মো. আরিফুল হাসান (২০০৬-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:); মেরুদন্ডি প্রাণী, প্রাণীভূগোল ও অভিযোজন বাস্তুবিদ্যা, সেরিকালচার, রেশম ও তুঁত গাছের ব্যাধি এবং আপদ অধ্যয়ন। টেলিফোন: ৭৫০৮৩৭; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

সারমিন আক্তার (২০০২-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:); ফিশ টেকনোলজি, ফিশারিজ বায়োলজি, রিসোর্স ও লিমনোলজি। টেলিফোন: ৮১১৮৫৭; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

কর্মরত সহকারী প্রফেসরবৃন্দ

মো. ফজলুল হক (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, এম. ফিল (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (মাহিদল, থাইল্যান্ড), জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি, সদস্য, আমেরিকান সোসাইটি ফর মাইক্রোবায়োলজি, বাংলাদেশ। সেলফোন: ০১৭১৭ ৭২২৬৩২; রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ।

শারমিন মুস্তারী (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:); জীবন সদস্য, বাংলাদেশ জেনেটিক্যাল সোসাইটি ও বাংলাদেশ কীটতত্ব সমিতি; জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি। টেলিফোন: ৭৫১৪৩২; রক্তের গ্রুপ বি নেগেটিভ।

মনিকৃষ্ণ মহন্ত (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি (রা: বি:); সদস্য, বাংলাদেশ জেনেটিক্যাল সোসাইটি; জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি, এনভাইরনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি ও টক্সিকোলজি। সেলফোন: ০১৭২৪ ০৫১৪৪০; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

ইশতিয়াক মাহ্ফুজ (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), এম. এস (স্কভদে, সুইডেন), পি-এইচ. ডি (মোনাশ, অস্ট্রেলিয়া), ক্রুপ প্রোটেকশন, মলিকিউলার বায়োলজি। টেলিফোন: ৭৬০৭৬৫; রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ।

মেহেরুন নেসা (২০১১-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:); ক্রুপ প্রোটেকশন ও টক্সিকোলজি। সেলফোন: ০১৭২৪ ২২৪৩৯০৫; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

খন্ডকালীন শিক্ষক

প্রফেসর মো. সোহরাব আলী (২০১৭-): বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (ঢা: বি:), এম. ফিল (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি: (১৯৮৮-৮৯); পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, রা: বি: (২০০০-০৩); সিনেটর, রা: বি: (২০০০-০৪); সিন্ডিকেট সদস্য, রা: বি: (২০০৩-০৪); প্রেসিডেন্ট, রা: বি: শিক্ষক সমিতি; অমেরুদন্ডি প্রাণী, কীটতত্ব; নেমাটোলজি ও ভার্মিকালচার; টেলিফোন: ৭৫০৩৪৪; রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

প্রেষণা, পি.আর.এল ও শিক্ষাছুটিতে অবস্থানরত শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর আনন্দ কুমার সাহা (২০১৭-) : উপ-উপাচার্য, রা: বি: (প্রেষণে); বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), এম. এস-সি (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), পি-এইচ. ডি (পুনে, ভারত), সিনেটর, রা: বি: (২০০৪-০৮); প্রেসিডেন্ট, রা: বি: শিক্ষক সমিতি; ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন; কোষতত্ব, বায়োটেকনোলজি ও কৃষি মাইক্রোবায়োলজি; টেলিফোন: ৭৫১০৯৫; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ।

সওদাগর মাহফুজার রহমান (১৯৮৭-) পি.আর.এল, জুলাই ২০১৭; বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (রা: বি:), পোস্ট-ডক্টোরাল ভিজিটর (নিউক্যাসল আপ অন-টাইন, যুক্তরাজ্য), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (২০০০-০৩); সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা: বি: (২০১২-১৪); রেশম জীনতত্ব, স্টোরড প্রোডাক্ট পেস্টের রেসিস্ট্যান্স্ কৌশল; টেলিফোন: ৭৬০৭৬৫; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ।

মো. মোশাররফ হোসেন (২০০২-): শিক্ষা ছুটিতে, চীনে; বি. এস-সি (সম্মান), এম. এস-সি (রা: বি:), পি-এইচ. ডি (কোন্নান, দ: কোরিয়া), পোস্ট-ডক্টোরাল ভিজিটর (চীন), পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো (কুনমিং ইন্সটিটিউট অব জুওলজি, চীন); কীটতত্ব, মলিকিউলার ভাইরোলজি ও ফিশ প্যাথোলজি। সেলফোন: ০১৭১২ ১৫১৪৯৮; রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ।

আপডেটেড: ডিসেম্বর, ২০১৭।

বিবর্তনের পথে

ইশরাত জাহান খান চৌধুরী ঈশিতা
দ্বিতীয় বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৬১২৫৫৯১৫১

পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও কি আদৌ প্রাণের অস্তিত্ব আছে? তারা কি আমাদের মত করেই জীবন ধারণ করে? তারা কি আমার বা আপনার মতই কোষ দিয়ে গঠিত? তাদের জেনেটিক বস্তুও কি DNA? তাদের পুষ্টি গ্রহণের প্রক্রিয়াই বা কেমন? আচ্ছা সেসব কথা বাদ দেই। আমরা আমাদের এই পৃথিবীকে নিয়ে কতটুকু জানি? নিজেদের সম্পর্কে না জেনে অপরের সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন।

হ্যাঁ, আজ আমি পৃথিবীর গল্প লিখতে বসেছি। ধারণা করা হয়, প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর আগে বিগব্যাং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল এই বিশ্বজগৎ। আর আমার গল্পের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে, সূর্যের জন্মের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের সূর্যের উৎপত্তি হয়েছে একটি সৌর নীহারিকা (Solar Nebula) থেকে। সৌর নীহারিকা হল ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রমন্ডলীর ধূলিকণা ও হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা গঠিত নিজ অক্ষের উপর আবর্তনশীল মেঘমালা, যেটি মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সব কিছু নিজ কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে। ফলে অণু-পরমাণুর প্রচন্ড গতিতে ঘর্ষণের ফলে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া সংগঠিত হয়। যার মধ্যে হাইড্রোজেন ক্রমাগত হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চমাত্রার শক্তি উৎপন্ন করে। এসব ক্রিয়া- বিক্রিয়ার কারণে নেবুলার কেন্দ্রের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উৎপত্তি হয় আদি সূর্য বা প্রোটোসান, যাকে আমরা এখন সূর্য (Sun) বলি। সূর্যে আজ অবধি এই নিউক্লিয় ফিউশন বিক্রিয়া চলছে এবং ধারণা করা হয় অবশিষ্ট জ্বালানী দিয়ে সূর্য আরো ৫ বিলিয়ন বছর যাত্রা করতে পারবে। কেন্দ্রে এর তাপমাত্রা ১৫.৭ মিলিয়ন কেলভিন, যেখানে পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাত্র ৫৮০০ কেলভিন।

সূর্যের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ডাস্ট বা ধূলিকণা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন আকৃতির ভাসমান পাথরপিন্ড (rock) গঠন করে। মহাকর্ষের সূত্রানুযায়ী এটা সূর্যকে পরিভ্রমণ শুরু করে। পরবর্তী ১০-১০০ মিলিয়ন বছর এই ডিম্বাকার পাথর পিন্ডরাই সূর্যকে পরিভ্রমণ করত। অসংখ্য ভাসমান পাথরপিন্ড একত্রিত হয়ে গ্রহাণু (planetesimals) গঠন করে। আর গ্রহাণু একীভূত হয়ে তৈরি করলো ৮টি গ্রহ। বিষয়টা অনেকটা এ রকম-

ধূলিকণা → পাথর ও নুড়িখন্ড → গ্রহাণু → গ্রহাণুপুঞ্জ → গ্রহ

পৃথিবীর বুকে তখন আগুনে গলিত পদার্থের স্রোত বইছে। পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তখন প্রায় ১২০০°সে.। পৃথিবী সৃষ্টির পরই আছে আমাদের একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ সৃষ্টি হবার ঘটনা। কারণ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য চাঁদ মামা কে যে দরকার !!

চাঁদ সৃষ্টি নিয়ে অনেক মতবাদ আছে যেমন, The Fusion theory, The Capture theory, The Condensation theory ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে গ্রহণীয় মতবাদ হল, আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম আর. ওয়ার্ড প্রদত্ত The Great Giant Impact hypothesis (1970). এই মতবাদ অনুযায়ী, ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগেই পৃথিবীর সাথে মঙ্গল গ্রহের সমান আকারের একটি বৃহৎ জ্বলন্ত বস্তুর সংঘর্ষ হয়। যার নাম থিয়া (Theia), যেটি ১৫ কি.মি./সে. বেগে পৃথিবীকে আঘাত করে। এটি ছিল বুলেটের বেগের চাইতে ২০গুণ দ্রুত। সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বিপুল পরিমানে জলন্ত পাথরপিন্ড ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর কক্ষপথে এবং থিয়া বিলীন হয়ে যায় পৃথিবীর গলিত অগ্নিগর্ভে। ওদিকে বিচ্ছিন্ন জলন্ত পাথরপিন্ডগুলো পৃথিবীর কাছাকাছি একীভূত হয়ে এক সময় চাঁদ মামার জন্ম হয়। যেহেতু সূর্য থেকে তার দূরত্ব পৃথিবীর সাথে দূরত্বের তুলনায় বেশি, সেহেতু পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের প্রভাবে তা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। এভাবেই জন্ম হল চাঁদের। এখন কথা হচ্ছে, চাঁদ যে পৃথিবীরই অংশ তার কি দলিল রয়েছে? থিয়া থেকেও তো আসতে পারত, তাই না!

মহাবিশ্বের গঠন থেকে আমরা দেখেছি প্রতিটি গ্রহ ও উপগ্রহতে বিভিন্ন পদার্থের নানা সংযুক্তি বিদ্যমান। ঠিক তেমনি পৃথিবীও অনেক মৌলের বিভিন্ন সংযুক্তিতে তৈরি। এটাও অজানা নয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে গলিত লোহা (Fe) ও নিকেল (Ni) আছে। এটাও স্বাভাবিক যে, হাল্কা মৌলগুলোর উপরের দিকে এবং ভারী মৌলগুলোর ক্রমাগত নিচে (মহাকর্ষ বলের কারণে পৃথিবীর কেন্দ্রে) তলানির ন্যায় জমা হবার ধর্ম আছে।

হুম! কাহিনী এখানেই। ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে সূচনালগ্নে, লোহা ও নিকেল এর পরমাণুগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ছুটে যেতে থাকে। ৫০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে মোটামুটি অধিকাংশ লোহা ও নিকেল কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ ৪.৪৫ বিলিয়ন বছর আগে The Great Giant Impact এর সময় পৃথিবীর উপরিভাগ (crust) এ লোহা ও নিকেল এর মাত্রা কম ছিল। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে প্রাপ্ত নমুনা বিশ্লেষণে দেখা গেছে সেখানে লোহা ও নিকেলের মাত্রা অনেক কম। চাঁদের অভিকর্ষ বল অনেক কম (১.৬২৫১৯ মি/সে$^{-২}$, প্রায় ১৬.৬%, যা পৃথিবী পৃষ্ঠের তুলনায় ০.১৬ গুণ মাত্র) হওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে, তার কেন্দ্র কোন ভারী পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়। তবে ঠিক কি দিয়ে গঠিত তা নিয়ে

গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। জন্মের পর চাঁদ মামা আমাদের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২২,০০০ কি.মি. দূর দিয়ে আবর্তন করত। তখন পৃথিবী এতই দ্রুত আবর্তন করত যে আকাশে সূর্য উদিত হবার ৩ ঘণ্টা পরই অস্ত যেত। তার মানে তখন পৃথিবীতে ৬ ঘণ্টায় ১ দিন ছিল।

৩.৯ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী পুনরায় গ্যালাক্সির অন্য কোন সৌরজগৎ গঠনের ফলে সৃষ্ট উল্কাপিন্ড (meteoroids) দ্বারা আক্রমণের স্বীকার হয়। এই উল্কাগুলো ভূ-পৃষ্ঠে লবণ স্ফটিক নিয়ে এসেছিল। যেসব স্ফটিক এর মধ্যে ছিল পানির অণু। জ্বী হ্যাঁ, এগুলো সেই লবণই ছিল যা আমরা এখন খাচ্ছি। কখনও তরকারিতে, কখনও বার্গার, পিৎজ্জা, এমন কি তেঁতুলের সাথেও !!

ছোটবেলায় সারমর্ম পড়তেন, মনে আছে? একটু মনে করিয়ে দেই। ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল। একেকটি উল্কা খুব কম পরিমানেই পানি ধারণ করতে পারে। কিন্তু প্রায় ২০ মিলিয়ন বছরের অনবরত উল্কা বৃষ্টি একটি মহাসাগর সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। সাগর, মহাসাগর নির্বিশেষে পানির প্রতিটি ফোঁটা বহু বিলিয়ন বছরের পুরোনো। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তখন প্রায় ৭০-৮০°সে., যা কঠিন ভূত্বক গঠনের জন্য যথেষ্ট...। এরপর সূর্যের তাপে পানি বাষ্প হয়ে মেঘ, বৃষ্টি তথা পানিচক্র চলতে থাকে।

চাঁদ সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করছে, ফলে তার মহাকর্ষ বল প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে বিশাল বিশাল হারিকেন ও ঘূর্ণিঝড়ে কম্পিত হতে থাকে পৃথিবী। ক্রমান্বয়ে, চাঁদ পৃথিবী থেকে দূরে সরতে থাকে এবং পৃথিবীর আহ্নিকগতিও কমতে থাকে।

৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাসাগরের তলদেশ থেকে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত শুরু হয় নতুন করে এবং আগ্নেয়দ্বীপ গঠন করে, যা পরবর্তীতে একত্রে যুক্ত হয়ে প্রথম মহাদেশ গঠন করে।

পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল তখনো বিষাক্ত (toxic)। সেই সাথে অসহনীয় তাপমাত্রা তো ছিলই। ৩.৮ বিলিয়ন বছর পর পৃথিবীতে আবার হঠাৎ করেই উল্কা বৃষ্টি শুরু হয়। উল্কা ভূপৃষ্ঠে ইতিমধ্যে পানি নিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার তারা কি নিয়ে এলো? গতবার উল্কাগুলো দ্রবীভূত হবার জন্য পানি ছিল না। এবার কিন্তু সেটা আছে। তারা এবার পানিতে নেমেই খনিজ দ্রব্য এবং সবচেয়ে আদি প্রোটিন অ্যামিনো এসিড দ্রবীভূত করে দিলো, যাকে কিনা আমরা জীবনের গাঠনিক একক বলে থাকি (তথ্যটি বিতর্কিত, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে)। সমুদ্রের প্রায় ৩০০মি. নিচে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারেনা, সেখানে ইতিমধ্যে অগণিত ধূমপথ (under water chimney) তৈরি হয়ে আছে। যা পানিকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করে তুলছে। উত্তাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে কোন বিক্রিয়ার হারকে বৃদ্ধি করে। উল্কা থেকে দ্রবীভূত হওয়া খনিজ ও অ্যামিনো এসিড পানির সংস্পর্শে কাছাকাছি আসে এবং জীবন সৃষ্টি করার জন্য যথাযথ বিক্রিয়া সম্পন্ন করে যাকে আমরা কেমিক্যাল স্যুপ বলে থাকি। এভাবেই আদিকোষীরা (Prokaryotes) তৈরি হয়। এটা বলা সত্যি দুরূহ যে, কেন এরা কাছাকাছি আসল এবং জীবন তৈরী করল। যা হোক, আমরা এইমাত্র জড় থেকে জীব এ প্রবেশ করলাম। পানির তলদেশ এখন ক্ষুদ্র অণুজীবে পরিপূর্ণ, এই এককোষী ব্যাক্টিরিয়া পৃথিবীর প্রথম প্রাণ।

৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে এককোষী ব্যাক্টিরিয়ারা কলোনী গঠন করে এবং কলোনীগুলো অনেকটা পাথুরে গঠনের ছিল। যাকে আমরা বলছি Stromatolites। এরা সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে এবং উপজাত হিসেবে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ত্যাগ করে। এভাবেই তারা সাগরের তলদেশ অক্সিজেনময় করে তোলে। অক্সিজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে কম হবার কারণে তা বায়ুতে উন্মুক্ত হয়। শুধু তাই নয়। অক্সিজেন পানিতে মিশে থাকা আয়রন (Fe) কে জারিত করে মরিচা ধরা লোহায় (rust iron) এ রূপান্তরিত করে। সেই আয়রন, যা দ্বারা সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, যা দ্বারা আজও আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হই। আবার এই আয়রনই পৃথিবীর বিবর্তনের অনেক প্রাচীন ঘটনার সাক্ষী। ২০১৬ সালের এ নিয়ে কিছু গবেষণায় নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত করেছে। সেটা কথায় পরে আসি।

প্রকৃতপক্ষে, অক্সিজেন ছাড়া কোন জীবই বাঁচতে পারবে না। এজন্য অবশ্যই এই প্রাচীন ব্যাক্টিরিয়া কলোনীকে ধন্যবাদ দিতে হবে,আর শোকর গুজার করতে হবে তাঁর যিনি এত কিছু এত নির্ভুলভাবে তৈরি করেছেন। পরবর্তী ২ বিলিয়ন বছর এভাবেই অক্সিজেন লেভেল বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি আরও কমে যায় এবং দিনগুলোও লম্বা হতে থাকে, আর তাপমাত্রা কমে নেমে আসে ৩০°সে. এ। এখন আমরা ১.৫ বিলিয়ন বছর আগের সময়ে এসে থেমেছি, যখন ১ দিন = ১৬ ঘন্টা প্রায়।

এরপর প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর ধরে (১.১ বিলিয়ন বছর আগে) পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ একত্রে জুড়ে তৈরী করে প্রথম সুপার মহাদেশ (Super Continent), যার নাম রোডিনিয়া (Rodinia)। তখন তাপমাত্রা প্রায় ৩০°সে. এবং ১দিন=১৮ঘন্টা। কিন্তু জটিল জীবনের খোঁজ পেতে হলে আমাদের সময়ের ঘড়িকে আরো এগিয়ে নিতে হবে...। তাপমাত্রা তখন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আর জীবন ধারণের জন্য কিছু সৌরশক্তি ও তাপমাত্রা পৃথিবীপৃষ্ঠে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। ০.৭৫ বিলিয়ন বছর আগে সুপার মহাদেশ আবার ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে যায়।

এরূপ অস্থিতিশীল ভৌগলিক অবস্থার কারণে আবার শুরু হয় আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, যা বায়ুতে উচ্চ মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে, যা ভূপৃষ্টের পাথর ও পাহাড়গুলো শোষণ করে নেয়। এমন অনেক পাথরের নমুনা এখনও অক্ষতভাবে বিদ্যমান আছে। কিন্তু

এতকিছুর পরও যথেষ্ট পরিমান কার্বন ডাই-অক্সাইড আবদ্ধ না করতে পারায় কয়েক বছরের মধেই তাপমাত্রা কমে -৫০°সে. এ পৌঁছে যায়। শুরু হয় বরফ যুগ !! বিজ্ঞানীরা একে "Snow Ball Earth" নামে অভিহিত করে থাকেন। বিষয়টা মজার না? জলন্ত অগ্নিপিন্ড পৃথিবীও একদিন বরফের বল ছিল। কিন্তু এই অবস্থা খুব বেশিদিন স্থায়ী হল না। আবারো নতুন নতুন আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাত শুরু করলো। এর আগেরবার যখন আগ্নেয়গিরি কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করেছিল, সেটা ভূপৃষ্ঠে থাকা পাহাড় ও পাথর শোষণ করে নিয়েছিল। কিন্তু এবার পাহাড়ের পৃষ্ঠ বরফে ঢাকা। তাই এবার কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করতে থাকে। এই গ্যাস অনেকটা কম্বল এর মত সূর্যের তাপকে পৃথিবীর বুকে আটকে রাখতে সাহায্য করে। ফলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। যাকে আমরা এখন গ্রীন-হাউজ বলি। পার্থক্য একটাই। তখন গ্রীন হাউজ এর ইফেক্ট পজিটিভ ছিল। আর এখন নেগেটিভ। পরবর্তী ১৫ মিলিয়ন বছর ধরে বরফগুলো গলতে থাকে।

এখন ০.৬ মিলিয়ন বছর আগে কথা বলছি, যখন ১ দিন = ২২ ঘণ্টা। এখন পৃথিবী জীবন ধারণের জন্য অনেকটাই উপযোগী। কিন্তু সেই এককোষী ব্যাক্টিরিয়া আর নেই। বরফ যুগে তারা বাঁচতে পারেনি। তবে, পানির তলদেশ আবারও আদিকোষী ব্যাকটিরিয়াতে ভরে গেল, সমুদ্রের বুকে আবারও প্রাণের স্পন্দন ফিরে এলো।

আমরা এখনও স্থলভাগে প্রাণের অস্তিত্ব পাইনি। ০.৪৬ বিলিয়ন বছর আগে আবার নতুন মহাদেশ গঠিত হয়। যাকে আমরা *গন্ডোয়ানা ল্যান্ড* হিসেবে জানি। তাপমাত্রা ৩০°সে., অক্সিজেনের মাত্রা বর্তমান সময়ের মতো এবং দিনের দৈর্ঘ্য ২৪ ঘণ্টা হয়ে এলো। কিন্তু কেন তবুও স্থলজ প্রাণীর আবির্ভাব হয়নি?... কারণটা হল সূর্যের বিকিরণ।

এবার কিন্তু কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ কি.মি. দূরে থাকা অক্সিজেন গ্যাস সূর্য বিকিরণের প্রভাবে ওজোন গ্যাসে (O_3) অর্থাৎ এ রূপান্তরিত হয়। অনেক ওজোন অণু একত্রিত হয়ে ওজোন স্তর সৃষ্টি করে, যা ভূপৃষ্ঠকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

পরবর্তী ১২০ মিলিয়ন বছরে ওজোন স্তর আরো পুরু হয়ে পৃথিবীকে সর্বোচ্চ স্তরের সুরক্ষা প্রদান করে। আর তাই এখন স্থলভাগ জীবন ধারণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মস জাতীয় উদ্ভিদ ছিল স্থলভাগের প্রথম জীবন। এরা অক্সিজেন মাত্রাকে বাড়াতে আরও সাহায্য করতে থাকে।

এভাবেই ধীরে ধীরে আগুনের পৃথিবী সবুজ পৃথিবীতে রূপান্তরিত হয়। এবং প্রাণের বিস্তার শুরু হয়। মহান আল্লাহ্ তায়ালা কতখানি যুক্তিপূর্ণভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। #

খুবই সাম্প্রতিক কিছু কথা লিখি এবার। উপরে আমি প্রথম ভূপৃষ্ঠ তৈরির সময় উল্লেখ করেছিলাম ৩.৮ মিলিয়ন বছর আগে। গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। নতুন ধারণাটা সংক্ষেপে এই রকম।... জীবন সৃষ্টির অন্যতম পূর্ব শর্ত হল পানি। কিন্তু অত্যানুকূল তাপমাত্রাও জরুরী। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর আহ্নিক গতিও অনেক বেশি ছিল। তার মানে, ২৪ ঘন্টার দিন শিশু পৃথিবীতে ছিলনা। অক্সিজেন মাত্রা ও এত স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ছিলনা ওজোনস্তর ও চুম্বক বলরেখা। ভূ-বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণা করছেন যে কিভাবে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো গঠিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে তারা কানাডার হাডসন উপসাগরের উত্তরপূর্বে এবং শুশুক উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গবেষণা চালিয়ে কিছু তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা সেখান থেকে বিভিন্ন পাথুরে নমুনাও সংগ্রহ করেন। এই পাথরগুলো এখন পর্যন্ত জানা মতে সবচেয়ে পুরাতন, যা আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে, যাকে আমরা বলছি আম্ফিবোলাইটস্ (amphibolites). যেগুলোর রাসায়নিক গঠন খুবই দুস্প্রাপ্য। এই আম্ফিবোলাইটস্ এর রেডিওমেট্রিক ডেটিং করার পর অনেক অবাক করা তথ্য বেরিয়ে আসে। পাথরগুলো ৪.৩-৪.৪ বিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয়েছিল। এটা থেকে সে সময়ে ভূপৃষ্ঠের পুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। ধারণা করা হয় যে, আম্ফিবোলাইটস্ ভূত্বকের ১২ মাইল গভীরে গঠিত হওয়া শুরু করেছিল। অর্থাৎ ৪.৩ বিলিয়ন বছর আগে সম্ভবত ১২ মাইল বা তদূর্ধ পুরুত্ববিশিষ্ট ভূত্বক ছিল। তার মানে ৪.৩ বিলিয়ন বছর আগেও পৃথিবীতে অবশ্যই ভূখন্ড ছিল। আরও বিস্ময়কর বিষয় হল, এই আম্ফিবোলাইটস্ শুধুমাত্র পানির নিচেই সৃষ্টি হতে পারে।

কি ভাবছেন? হ্যাঁ, জন্মের মাত্র ২০০ মিলিয়ন বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে মহাদেশ তৈরি হয়েছিল যেখানে ছিল, সাগর আর তার বিশাল জলরাশি। এই গবেষণার একটি শক্ত দলিলও অচিরেই মিলল, যখন একই স্থান থেকে একই পাথরের নমুনায় ডোরাকাটা লোহা ও সিলিকনের স্তরের খোঁজ পাওয়া গেল। এই ধরণের পাথরগুলোতে উজ্জ্বল সিলিকা ও অনুজ্জ্বল লৌহের ডোরাকাটা স্তর রয়েছে। লোহাগুলো আসলে ম্যাগনেটাইট ছিল। অর্থাৎ এদের চুম্বক ধর্ম বিদ্যমান ছিল। এই ম্যাগনেটাইটগুলো শুধুমাত্র গভীর পানির নিচেই তৈরি হতে পারে।

কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু অংশ পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোন ধারণা দিতে পারেন নি। শুধুমাত্র প্রথম ভূত্বক সৃষ্টি নিয়েই এমন দ্বিমত আছে। কারণ, আরো নতুন নতুন নমুনা ও তথ্য গবেষণায় বেরিয়ে আসছে। এছাড়া, বাকি সব ঘটনা একই রকম।

তথ্যসূত্রঃ

Alberts, B; Johnson, A; 2008. *Molecular Biology of the Cell* (5th edn). Garland Science, Taylor and Francis Group LLC. 270 Madison Avenue, New York. 1725pp.

Watson, J.D.; Baker, T.A.; 2013. *Molecular Biology of the Gene* (7th edn). Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York. 911pp.

https://www.khanacademy.org/partner-content/big-history-project/solar- system-and-earth/earth-and-form-solar-system/a/how-our-solar-system-formed

http://www.space.com/35526-solar-system-formation.html

http://www.space.com/19275-moon-formation.html

https://m.youtube.com/watch?v=xyhZcEY5PCQ

https://m.youtube.com/watch?v=d0z9x55EGh8

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় : পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি ধ্বস

মো. আলমগীর

৩য় বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৫১০৯৫৯১১০

বাংলাদেশের একটি সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক, প্রকারন্তরে মানবসৃষ্ট বিপর্যয় হলো পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি ধ্বস। বিষয়টি সংক্ষেপে নিচে আলোচিত হলো।

পাহাড় ধ্বসের কারণঃ বাংলাদেশে পাহাড় ধ্বসের কারণে নানা সময়ে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হওয়ার সংখ্যাও কম নয়। ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও বান্দরবানে পাহাড় ধ্বসে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু কেন পাহাড় ধ্বস? বাংলাদেশে ঘন ঘন পাহাড় ধ্বসের কারণও বা কি? জানা যায় যে, পাহাড়ের ধ্বসের মূল কারণ হলো- বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের উপরের দিকের মাটিতে কঠিন শিলার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। ফলে পাহাড় ধ্বসের আশংকা এমনিতেই বেশি। তাছাড়া, মানুষ এসব জায়গায় বসবাসের ও চাষাবাদের জন্য পাহাড়ের উপরের দিকের শক্ত মাটির স্তরও কেটে ফেলে। পাশাপাশি বড় গাছপালা কেটে ফেলায় ভারি বৃষ্টিপাত হলেই পাহাড়ের মাটি ধ্বসে পড়ে। জিওসায়েন্স অস্ট্রেলিয়ার (Geo-Science Australia) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, পাহাড় ধ্বসের পিছনে প্রাকৃতিক কারণ ও মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক কারণ হলো পাহাড়ের ঢাল যদি এমন হয় যে, ঢালের কোন অংশে বেশি গর্ত থাকে তখন অতিবৃষ্টিতে ভূমি ধ্বস হতে পারে। এছাড়া ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং পাহাড়ের পাদদেশের নদী ও ঢেউ থেকেও পাহাড় ধ্বস হতে পারে। আর মানবসৃষ্ট কারণ হিসেবে গবেষণায় বলা হয়েছে, পাহাড়ের গাছপালা কেটে ফেলা, মাটি কেটে ফেলা, পাহাড়ে প্রাকৃতিক খাল বা ঝর্ণার গতি পরিবর্তন করা, পাহাড়ের ঢালুতে অতিরিক্ত ভার দেওয়া এবং খনি খননের ফলশ্রুতিতে পাহাড় ধ্বস হতে পারে।

চিত্রঃ ২০১৭ সালে দেশের পার্বত্য অঞ্চলের একটি পাহাড়ি ধ্বস।

পাহাড়ি ধ্বস প্রতিরোধে কয়েকটি পরামর্শ

১. পাহাড়ি এলাকার ১০ কি.মি এর মধ্যে ইট ভাটা স্থাপনের অনুমিত প্রদান নিষিদ্ধ করা।
২. পাহাড়ি এলাকার ৫ কি.মি এর মধ্যে হাউজিং প্রকল্পের অনুমোদন নিষিদ্ধ করা।
৩. ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়গুলোতে অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৪. কোন একক সংস্থা, বিভাগ কিংবা মন্ত্রণালয়ের পাহাড় পাদদেশ কেটে কোন স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা রহিত করা।
৫. পাহাড় লিজ নিয়ে যারা পাহাড় ধ্বংস করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

তথ্য কণিকা ১

বিপন্নপ্রায় পদ্মার ঘড়িয়াল

আসাদ-উল্লাহ চৌধুরী, তৃতীয় বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৩০৮৬৬৬৯

বিপন্নপ্রায় পদ্মার ঘড়িয়াল

ঘড়িয়াল (Gharial) বিরল প্রজাতির মিঠাপানির কুমির। বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus*। এদের লম্বা নাক বা snout থাকে। বাংলাদেশে এরা ঘড়েন, বাইশাল বা মেছো কুমির নামেও পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

১. কুমিরের মত দেখতে হলেও এরা মোটেও আগ্রাসী নয়।
২. এদের চোয়াল লম্বাটে শুঁড়ের মতো। ওপরের চোয়ালে ৬০টি এবং নিচের চোয়ালে ৪৮টি ছোট এবং তীক্ষ্ণ দাঁত আছে। এরা পা ও লেজের সাহায্যে সাঁতার কাটে।
৩. লম্বায় এরা ২০ ফুটের কাছাকাছি। স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষেরা লম্বায় বড় হয় ।
৪. এদের নাকের উপর কলস বা ঘড়া আকৃতির একটি পিন্ড থাকে। এই কারণেই মূলত এদের এই নামকরণ।
৫. পিঠ ও লেজ কাঁটাযুক্ত শক্ত আঁশে মোড়ানো। এদের হৃৎপিন্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।
৬. চৈত্র মাস এদের প্রজনন ঋতু। এদের ডিম ধবধবে সাদা ও ক্যাপসুলের মতো। মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে এদের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।
৭. ঘড়িয়ালের প্রধান খাদ্য মাছ। আঁশবিহীন মাছ এদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। বিশেষ করে বোয়াল, আইড়, গুঁচি, চিতল ইত্যাদি এদের প্রিয়।
৮. এদের লম্বা চোয়াল মাছ ধরার জন্য খুবই উপযোগী। মাছ প্রধান খাবার বলে এরা মেছো কুমির নামে পরিচিত।
৯. এরা মাছ, সাপ ও ব্যাঙ ছাড়া অন্য কিছু তেমন খায় না। তবে কালেভদ্রে জলজ পাখি খেয়ে থাকে।
১০. প্রজনন উপযোগী হতে এদের দীর্ঘ সময় লাগে। পুরুষ ঘড়িয়াল ১৩ বছরে ও স্ত্রী ঘড়িয়াল ১৬ বছর পর প্রজননে এরা সক্ষম হয়। এরা ৫০ বছর প্রজননক্ষম থাকে এবং প্রায় ১০০ বছর বাঁচে।

অবস্থান ও বিলুপ্তির কারণ

ঘড়িয়াল ঐতিহ্যবাহী ও খুবই প্রাচীন একটি প্রাণী। মূলত পদ্মা-যমুনাতেই এদের প্রধান আস্তানা। বাংলাদেশ ছাড়াও উত্তর ভারত, নেপাল, ভূটান ও পাকিস্তানে এদের দেখা মিলতো, তবে এখন পাকিস্তান ও ভূটানে কোন ঘড়িয়াল নেই। বাংলাদেশে ঘড়িয়ালের আবাস প্রধানত যমুনা নদীর ফুলছড়ি ঘাট থেকে নগরবাড়ী ঘাট পর্যন্ত এবং পদ্মা নদীর চারঘাট থেকে গোদাগাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের নাম Red Deta Book of IUCN এ অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ দুনিয়া থেকে এরা চিরতরে হারিয়ে যেতে বসেছে। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ২০০টির মতো বুনো ঘড়িয়াল রয়েছে। ঘড়িয়াল দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো বলে জেলেদের জালে এরা আটকা পড়লে জেলেরা এদের কুমির ভেবে পিটিয়ে মেরে ফেলে। পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ঘড়িয়ালকে পবিত্র ভেবে একসময় দেবতা বিষ্ণুর পূজায় উৎসর্গ করতো। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তখন এদের মানুষ হত্যা করতো না। ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় বিশ্বাস উঠে গেলে মানুষ মূল্যবান চামড়ার জন্য এদের নিধন শুরু করে। মহিলাদের হাতব্যাগ, জুতা, গৃহসজ্জার জিনিসপত্রসহ অন্যান্য সৌখিন জিনিস এদের চামড়া দিয়ে তৈরী হয়। ফলে এদের সংখ্যা দিন দিন কমতে শুরু করে।

ঘড়িয়াল রক্ষার্থে উদ্যোগ গ্রহণ

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (IUCN) ও বাংলাদেশ বন বিভাগ সম্প্রতি "ঘড়িয়ালস্ অব বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি গবেষণা চালিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণাটিতে চিড়িয়াখানায় ঘড়িয়ালের সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। গবেষণায় বলা হয়, এই মুহূর্তে রংপুরে চারটি স্ত্রী ঘড়িয়াল, ঢাকায় চারটি পুরুষ ঘড়িয়াল, রাজশাহীতে দুটি স্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে একটি পুরুষ ঘড়িয়াল রয়েছে। বিপন্নপ্রায় এই বিরল প্রজাতির বিলুপ্তি ঠেকাতে এদের আবদ্ধ জায়গায় প্রজননের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা চিড়িয়াখানা থেকে একটি ৪১ বছর বয়সী পুরুষ ঘড়িয়াল *গড়াই*-এর সাথে রাজশাহী চিড়িয়াখানার পুকুরের ৪০ বছর বয়সী মাদি ঘড়িয়াল *পদ্মা*-এর জোড় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. দৈনিক প্রথম আলো – তারিখ ৩১.০৮.২০১৭;
২. দৈনিক সংগ্রাম – তারিখ ২৯.০৩.২০১৭;
৩. কালের কণ্ঠ – তারিখ ১২.০৮.২০১৭;
৪. গুগল।

তথ্য কণিকা ২

ডোডো রহস্য

আসাদ-উল্লাহ চৌধুরী, তৃতীয় বর্ষ (সম্মান); রোল: **১৩০৮৬৬৬৯**
ও **মোহাম্মদ সুমন,** তৃতীয় বর্ষ (সম্মান); রোল: **১৫১০৮৫৯১৩৮**

ডোডো রহস্য

ডোডো (Dodo) হচ্ছে এক প্রজাতির পাখি। এর নামটা কেমন জানি অদ্ভুদ। পাখিটির নামটি যেমন অদ্ভুদ, এটি দেখতেও তেমনি অদ্ভুদ। ভাবছেন, অদ্ভুদ পাখিটিকে দেখতে হয়। তবে সে আশায় গুঁড়ে বালি। আপনি চাইলেও আর এই পাখিটিকে দেখতে পাবেন না। কী করে দেখবেন, পাখিটি আর পৃথিবীতেই নেই। মরিশাসে **১৬৬২** সালে সর্বশেষ দেখা মেলে এই পাখির। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Raphus cucullatus*। এদের আকার সম্পর্কে জানতে গিয়ে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। এদেরকে অনেকে উট পাখির সাথে তুলনা করেছেন আবার অনেকে বলেন এদের আকার ছিল মুরগীর চেয়ে সামান্য বড়। এদের মূল আকর্ষণ ছিল বাহারি রং এর ঠোঁট ও কুবুতরের মতো ছোট ডানা ও পালক।

বৈশিষ্ট্য

১. ডোডো পাখি মূলত উড়তে পারতো না। তাই মাটিতে বাসা তৈরী করত।
২. এদের গায়ের রং ছিল ধূসর-বাদামী রঙ্গের।
৩. এদের ঠোঁট ছিল লম্বা এবং বাহারী রঙ্গের।
৪. প্রজননের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হতে এদের প্রচুর সময় লেগে যেত।
৫. বছরের আগষ্ট মাসের দিকে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতো।
৬. পরবর্তীতে মার্চ মাসের মধ্যেই এগুলো পালকে ঢেকে যেত।
৭. নির্দিষ্ট সময়ই এদের প্রজনন সম্পূর্ণ হতো।

অবস্থান ও নামকরণ

ভারত মহাসাগরে পূর্ব আফ্রিকার দ্বীপদেশ মরিশাস ছিল এদের আবাস। এদের প্রথম খুঁজে পায় ডাচ বা ওলন্দাজরা। তারা এই পাখির নাম দেয় *ওয়াক্লভোগেন*। এর অর্থ হচ্ছে অরুচি বা অভক্তি। এই রকম নামকরণের কারণ হচ্ছে এই পাখির মাংস খেতে ছিল খুবই বিচ্ছিরি। তবে এদের পাকস্থলী ও বুকের মাংস খেতে সুস্বাদু ছিল।

খাদ্যাভাস

ডোডো ছিল পেটুক পাখি, আবার অনেকে একে বলতো লোভী পাখি। এর মূল কারণ মরিশাসে বর্ষাকাল শেষ হলে গাছের ফলগুলো পেকে একদম টসটসে হয়ে থাকতো। সেই ফলগুলো দেখে তারা লোভ সামলাতে পারতো না। তারা সেই ফলগুলো পেটুকের মতো খেত। তাই শুকনো মৌসুম এলে তাদের আর কিছু না খেলেও চলতো। মরিশাসে *তাম্বস্থালাচোক* নামের এক ধরনের গাছের জন্ম হতো। সেই গাছের বংশ বিস্তার ডোডো পাখির উপর নির্ভরশীল ছিল। গাছটির ফল ডোডো পাখি খেলে তা তাদের পেটে গিয়ে প্রক্রিয়াজাত হয়ে বীজ আকারে বের হতো আর সেই বীজ থেকে নতুন *তাম্বস্থালাচোখ* গাছের জন্ম হতো। তাই এই গাছটিকে ডোডো ট্রিও বলা হতো।

বিলুপ্তি

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলফিন অ্যাংস্ট কয়েকটি জাদুঘর ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা ডোডোর কিছু হাড় পরীক্ষার সুযোগ পান। তিনি ও তার দল বিভিন্ন সূত্র থেকে ২২টি ডোডোর হাড় সংগ্রহ করে সেগুলোর উপর গবেষণা করেন। *Nature* পাবলিকেশন গ্রুপের অনলাইন জার্নাল সায়েন্টিফিক *রিপোর্টস*-এ এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ডোডোর বিলুপ্তির জন্য মানুষের দায়টাই সবচেয়ে বেশী বলে মনে করছেন তাঁরা। মরিশাসে মানুষ পৌঁছানোর পর এক শতকের কম সময়ের মধ্যে পাখিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। উড়তে না পারায় মাটিতেই বাসা বানাত তারা। কাজেই এসব বাসায় ডিম চুরি হয়ে যাওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। ডেলফিন অ্যাংস্টের মতে, মরিশাসে মানুষ পৌঁছানোর পরই ডোডোর বিলুপ্তি ঘটে।

বর্তমান ধারণা

ডোডোর ওপর এই গবেষণার সহযোগী লন্ডনের *ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম*-এর জুলিয়ান হুমে বলেন, ডোডোকে কেন্দ্র করে এখনো অনেক রহস্য রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই গবেষণায় পাখিগুলোর প্রজনন আর বেড়ে ওঠার তথ্যই পাওয়া গেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. দৈনিক প্রথম আলো – তারিখ ২৬.০৮.২০১৭;
২. দৈনিক কালের কণ্ঠ – তারিখ ৩০.০৮.২০১৭;
৩. দৈনিক নয়াদিগন্ত – তারিখ ২১.০১.২০১৭;
৪. গুগল।

Some extraordinary jellyfishes

Md. Badsha Alam
2nd year (Honours); Roll 9185

Jellyfishes or jellies are soft bodied, free-swimming aquatic animals with a gelatinous umbrella-shaped bell and trailing tentacles. The bell can pulse to acquire propulsion and locomotion. The tentacles may be utilized to capture prey or defend against predators by emitting toxins in a painful sting. Jellyfish are found in every ocean from the surface to the deep sea. The most venomous jellyfish is the box jellyfish which produces enough poison to kill 60 humans and is the reason for one death per year. Here some gorgeous alien-looking species.

Cauliflower jellyfish (*Cephea cephea*): The cauliflower jelly is more beautiful and strange than its name suggests. The cauliflower jelly is named for the wart-like projections on its bell, which resemble the vegetable. While that does not sound very pretty, the species itself is beautiful. Found in the mid-pacific to the indo-pacific, and also in the Atlantic ocean off of West Africa, the cauliflower jelly is an oceanic species that can grow relatively large, reaching diameters of 1.5 to 1.9 feet. Much like its vegetable namesake, it is something you can find on dinner plates well, in China and Japan, anyway. The species is considered a delicacy and also utilized for medical purpose.

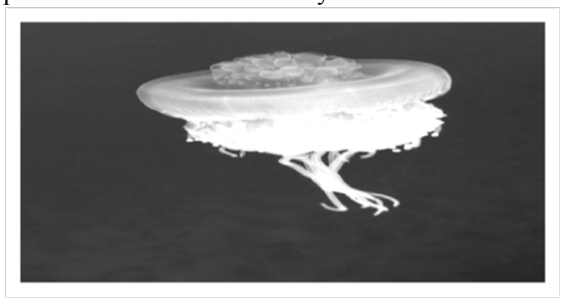

Fig. 1 Cauliflower jellyfish

Crystal jellyfish (*Aequorea victoria*): In the water off North America's west coast lives the crystal jellyfish, a species that is completely colourless and has up to 150 delicate tentacles lining its glass like bell. This gorgeous jellyfish species looks crystal clear in daylight. But the transparency belies a brighter side. According to Monterey Bay Aquarium, crystal jellies are brightly luminescent jellies, with glowing point around the margin of the umbrella. The components required for bioluminescence include a Ca++ activated photoprotein, called aequorin, that emits a blue green light, and an accessory green fluorescent protein (GFP), which accepts energy from acquorin and re-emits it as green light. Scientists have created green mice that glow green when hit by blue light by inserting the GFP gene from crystal jelly into the mice. The glowing protein is a widely used biological highlighter that helps scientists find and study gene more quickly.

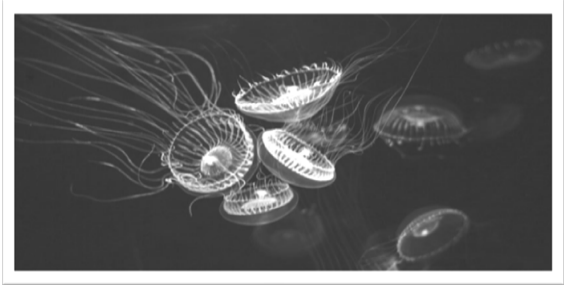

Fig. 2 Crystal jellyfish

White-spotted jellyfish (*Phyllorhiza punctata*): White-spotted jellies are one species you don't have to fear. The mild venom isn't problem for human. These filter feeders are more focused on minuscule zooplankton, and an individual can filter as much as 13000 gallons of water a day in it quest for a meal. The down side of this is a swarm of white-spotted jellies can clear an area of zooplankton, leaving none for the fish and crustaceans that also make a meal of the microscopic critters. In areas where they are considered an invasive species, such as the Gulf of California, Gulf of Mexico and Caribbean Sea, their voracious appetite poses a problem for native species from corals to crustaceans such as shrimp.

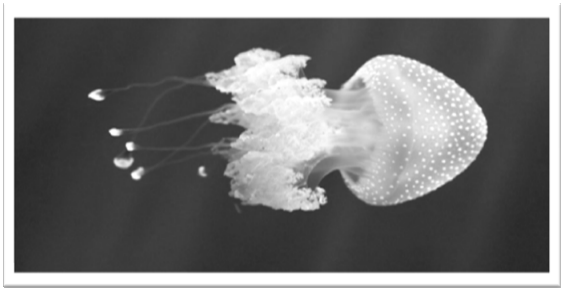

Fig. 3 White-spotted jellyfish

Black sea nettle (*Chrysaora achlyos*): Another red denizen of the deep is the black sea nettle. This species found in the water of the pacific from southern California to baja California, is a giant among jellyfish. Its bell can reach three feet across its arms can be twenty feet long and its stinging tentacles twenty five feet long. It would be pretty scary to find yourself in the middle of a bloom. Though enormous, the species is relatively new to science and not well known. Part of this is because there very difficult to raise in captivity and they are not often encountered in the wild. There have been a few surface blooms of black sea nettles, with the invertebrate giants appearing in large numbers in 1989, 1999 and 2010. Other than these blooms, where black sea nettles hang out and what they are up to is still a bit of a mystery.

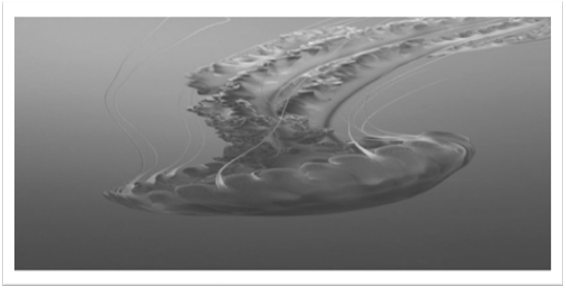

Fig. 4 Black sea nettle

Flower hat jellyfish (*Olindias formosus*): This extraordinarily colourful and odd species is endemic to the Western Pacific, primarily off the cost of Southern Japan, but it also found in water off Brazil and Argentina. Rather than pulsing their way through the ocean, flower hat jellyfish often hang out near the ocean floor among sea grasses where they catch prey of small fish. They may look gorgeous, but you don't want to get close. They pack a nasty sting. According to Monterey Bay Aquarium, Blooms of the flower hat jellies make swimming in water off Argentina hazardous. The sting of this jelly is painful, leaving a bright rash. In Brazil, blooms of the flower hat jellies interfere with shrimp fishing; the jellies clog their nets and drive shrimp away, probably to deeper water.

Fig. 5 Flower hat jellyfish

Mediterranean or fried egg jellyfish (*Cotylorhiza tuberculata)*: The bell of the jellyfish is surrounded by a lighter ring, which forms something of a moat, and combined the bell looks very much like a favourite breakfast food. The species is commonly found in the Mediterranean Sea, Aegean Sea and Adriatic Sea. The mouth-arms of the fried egg jellyfish are truncated, and there are longer projections with disk-like ends. The overall effect makes it look dotted with purple and white pebbles. This species only survives for about six months, from summer to winter,

dying when the water cools down. The species feed on Zooplankton, rather than fish. Juvenile fish can hide inside the fried egg jellyfish tentacles for protection.

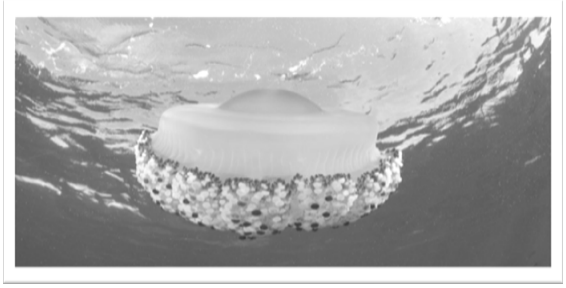

Fig. 6 Fried egg jellyfish

Atolla jellyfish (*Atolla wyvillei*): The Atolla jellyfish, also called coronate medusa, is a deep sea jelly found around the world. Like many species of animals dwelling in the deep, it has bioluminescent abilities. But unlike many species that use bioluminescence to attract prey, this species use it to keep from becoming prey. When an atolla jellyfish is attacked, it will create a series of flashes that spin like the lights of a police siren. This draws in more predators that will hopefully be interested in the original attacker more than the jellyfish opportunity to escape. This strategy has given the species the nickname the Alarm jellyfish.

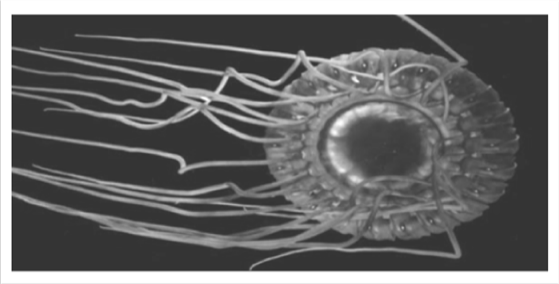

Fig. 7 Atolla jellyfish

Narcomedusae (*Bathykorus bouilloni)***:** This deep sea hydrozoan jellyfish has a distinctly Darth Vader like appearance. This unusual looking species of jellyfish has not one but two stomach pouches. To fill those pouches with plenty of prey, it will hold its long tentacles out in front of it while it swims. Researchers think this makes them a more effective ambush predator. According to creature cast, some species of Narcomedusae (affectionately called narcos by the people that study them) can grow inside their own mother who provides nourishment and the safe environment for her. The narco babies can then leave their mother, find another jellyfish of an entirely different species, attach to its flesh, and thrive on the nourishment and safe environment it provides.

Fig. 8 Narcomedusae

Compass jellyfish (*Chrysaora hyoscella)***:** This is less commonly seen resident of the Mediterranean Sea. So named because of the striking striped pattern that adorns its umbrella, the compass jellyfish floats along the current in a mesmerizing way. Be warned, though the compass jelly has a stinger, and it knows how to use it but its not as painful as other species of jellyfish.

Fig. 9 Compass jellyfish

Upside down jellyfish (*Cassiopea andromeda*): The inverted nature of this jellyfish lets it remain seated along the sandy bottom of the Mediterranean Sea, contributing to its surprisingly anemone like appearance. The upside down jelly is remarkable because it has a symbiotic relationship with algae and shrimp. Shrimp live safely within the jelly's tentacles, keeping it free of parasites; the algae lives within the jellyfish, providing sustenance for the jelly and also giving the jellyfish its brownish colour.

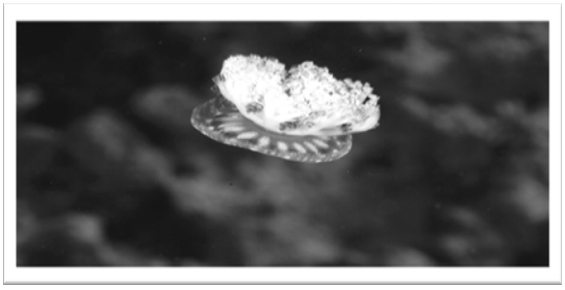

Fig. 10 Upside-down jellyfish

Reference: https://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/extraordinary-jellyfish-species.

তথ্য কণিকা ৩

ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (*Erythroblastosis foetalis*)

ড. শারমিন মুস্তারী

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় এক ট্রিলিয়ন সংখ্যক লোহিত রক্ত কণিকা (red blood corpuscles) বা RBC থাকে যা erythrocytes নামে পরিচিত। এই লোহিত রক্ত কণিকা অক্সিজেন, আয়রন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শরীরের যথাস্থানে স্থানে পৌঁছে দেয়। যখন একজন মহিলা গর্ভবতী হন তখন তাঁর সন্তানের রক্তের গ্রুপ এবং তাঁর রক্তের গ্রুপের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা হতে পারে আর এই অসামঞ্জস্যতার ফলে তাঁর বাচ্চার *erythroblastosis foetalis* এর প্রভাবে haemolytic anaemia হতে পারে। দু'টি প্রধান কারণে *erythroblastosis foetalis* হতে পারে। একটি রেসাস ফ্যাক্টর (Rh) অসামঞ্জস্যতা ও অন্যটি ABO রক্তের গ্রুপের অসামঞ্জস্যতা। আমরা জানি চারটি প্রধান রক্তের গ্রুপ A, B, AB ও O রয়েছে এবং এদের রেসাস ফ্যাক্টর পজিটিভ (Rh^+) ও নেগেটিভ (Rh^-) হতে পারে। যখন কোন রেসাস ফ্যাক্টর নেগেটিভ (Rh^-) মহিলার, রেসাস ফ্যাক্টর পজেটিভ (Rh^+) পুরুষের সাথে বিয়ে হয় এবং তাঁদের সন্তান রেসাস ফ্যাক্টর পজিটিভ Rh^+ হয়, সেক্ষেত্রে বাচ্চার এন্টিজেন (antigen, যা লোহিত রক্ত কণিকায় থাকে) মায়ের এন্টিবডি (antibody, যা সিরামে থাকে) দ্বারা ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার মতো বহিঃশত্রুরূপে চিহ্নিত হয়। মায়ের antibody বাচ্চার লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে রক্ত কণিকাগুলি ভেঙ্গে ফেলে (haemolysis), যেটি বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। তবে *erythroblastosis foetalis* বা নবজাতকের haemolytic anamia রোগটি বর্তমানে একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব হলে একটি সুস্থ বাচ্চার জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়। যদি বাবার রক্তের গ্রুপ Rh^+ এবং মায়ের রক্তের গ্রুপ Rh^- হয়, সেক্ষেত্রে মার রক্ত ভ্রুণের ১৮–২০–সপ্তাহে এবং ২৬–২৭ সপ্তাহে পরীক্ষা করতে হয়। তবে foetus বা ভ্রুণের রক্ত-কদাচিৎ পরীক্ষা করা হয়। কারণ এটা একটি কঠিন এবং তুলনামূলকভাবে শঙ্কাযুক্ত পদ্ধতি। কোন মায়ের রক্তের antibody level বাড়তে শুরু করলে চিকিৎসক foetus এর cerebral artery এর রক্ত প্রবাহ সনাক্ত করেন, যা কিনা বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর নয়। বাচ্চার রক্ত প্রবাহ আক্রান্ত হলে *erythroblastosis foetalis* হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জন্মের পরে কোন বাচ্চার যদি জন্ডিস হয়, কিন্তু যদি রেসাস ফ্যাক্টর Rh^- এর অসামঞ্জস্যতা না থাকে তবে বাচ্চার ABO অসামঞ্জস্যতা আছে বলে ধরে নেয়া হয়। যদি কোন মায়ের রক্তের গ্রুপ O হয় এবং তাঁর গর্ভস্থ বাচ্চা যদি A, B অথবা AB গ্রুপের হয়, তবে O রক্ত গ্রুপের α এবং β উভয় antibody থাকে, যা বাচ্চার রক্তকে আক্রমণ করে। তবে ABO রক্ত গ্রুপের অসামঞ্জস্যতা রেসাস ফ্যাক্টরের অসামঞ্জস্যতার তুলনায় মৃদু। Coombs blood টেস্ট এর মাধ্যমে ABO এর অসামঞ্জস্যতা নির্ণয় করা যায়। প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা হিসাবে D (Rh^o) immune globulin বা anti-D এন্টিবডি ইঞ্জেকশন প্রয়োগ Rh^- মায়ের গর্ভস্থ Rh^+ বাচ্চার এন্টিজেনের প্রতিক্রিয়া কমিয়ে দেয়। ফলে বাচ্চার *erythroblastosis foetalis* জনিত জটিলতা কিংবা মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

রাজশাহী জেলায় দেখা কয়েকটি বিপদাপন্ন পাখি

প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন ও প্রফেসর ড. এ. এম. সালেহ রেজা

বাংলাদেশকে 'পাখির দেশ' বলা হয়। বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষের তথ্য মতে এদেশের মোট পাখি প্রজাতির সংখ্যা ৬৫০; বিভিন্ন পাখি বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে তা হতে পারে ৭২০ বা ৭৮০। বর্তমান বিশ্বে পাখিসহ বহু বন্যপ্রাণী প্রজাতি হারিয়ে যাবার পথে, সেই প্রজাতিগুলিকে বলা হয় বিপদাপন্ন প্রজাতি (threatened species)। বাংলাদেশের বেশ কিছু পাখি-প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে যেমন- শকুন, ময়ূর, সাদা-ডানা হাঁস ইত্যাদি। গোলাপি হাঁসকে মনে করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত (extinct) হয়ে গেছে। মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নদী জলাশয় শুকিয়ে যাওয়া, বনভূমি কমে যাওয়া, শিল্পায়ন ও কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধির কারণে পাখিদের আবাস, খাদ্যভান্ডার ও প্রজননক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবী জুড়েই পাখিদের প্রজাতি সংখ্যা কমে আসছে।

বন্যপ্রাণী প্রজাতিদের গণসংখ্যা ভিত্তিতে IUCN (International Union for Conservation of Nature) বিভিন্ন প্রজাতিকে চিহ্নিত করেছে বিপন্নপ্রায় (near threatened), বিপদাপন্ন (threatened), বিপন্ন (endangered), অতিবিপন্ন (vulnerable) ও বিলুপ্ত (extinct) হিসেবে। এছাড়াও কোন প্রজাতির গণসংখ্যা কোন দেশে জরিপ না হয়ে থাকলে সেই প্রজাতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় তথ্য অপ্রতুল। বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিপদাপন্ন (threatened) পাখি প্রজাতির সংখ্যা বিশ্বে ৪৫টি এবং বাংলাদেশে প্রায় ৩০টি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বার্ড কনজারভেশন টিম ২০০৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জরিপ করে সমগ্র রাজশাহী জেলার পাখি প্রজাতির একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেছে; তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯টি প্রজাতি বিভিন্ন বিপন্ন ক্যাটাগরির তালিকায় আছে (সারণি ১)। নিঃসন্দেহে এই তথ্যটি বাংলাদেশের পক্ষীগবেষণার জন্য অতি মূল্যবান। পাঠকদের জন্য এই পাখিগুলির বাংলা নাম ও রাজশাহী জেলার কোথায় দেখা গেছে সংক্ষেপে তা' জানানো হলো। চিত্র ১-১৯ এ পাখিগুলির ছবি সন্নিবেশিত হলো।

বিপন্নপ্রায় (near threatened) **প্রজাতিঃ** ১০টি প্রজাতি এই তালিকায় আছে যেমন- টিকি হাঁস, বাদামি ঝিল্লি, কালো লেজ জৌরালি, এশিয় ডওচার, ধলা কাপাসি, সোনা জঙ্ঘা, মাছ মুরাল, গয়ার, কালোমাথা কাস্তেচোরা ও ভূতি হাঁস। এদেরকে রাজশাহী ও গোদাগাড়ি সংলগ্ন পদ্মা নদীর চরে দেখা যায়। মাছ মুরাল বাস করে পদ্মা চরে, মোহনপুর বিল অঞ্চলে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, পুঠিয়া উপজেলার পচামাড়িয়া ও গোদাগাড়ির ঝিকড়াপাড়া পাখি গ্রামে। পদ্মা নদীতে গয়ার দেখা যায়। কালোমাথা কাস্তেচোরা পচামাড়িয়া ও ঝিকড়াপাড়ায় বাস করে। ভূতি হাঁস দেখা গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

বিপন্ন (endangered) **প্রজাতিঃ** পদ্মা চরে নদী টিটির দেখা পাওয়া যায়। বিশ্ব জুড়ে পাখিটির গণসংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে এবং বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় আছে। তাছাড়া ফিনের বায়া এই তালিকায় আছে। ফিন-এর বায়া, বাবুই পাখিদের একটি প্রজাতি, যার নাম বাংলাদেশের পাখি তালিকায় নাই; কিন্তু প্রজাতিটি গোদাগাড়ির ঝিকড়াপাড়ায় আছে।

অতিবিপন্ন (vulnerable) **প্রজাতিঃ** তিনটি অতি বিপন্ন প্রজাতি, যেমন- বড় চিত্রা ঈগল, মদনটাক ও ছোট কেস্ট্রেল রাজশাহী এলাকায় দেখা যায়। বড় চিত্রা ঈগল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও পদ্মা চরে মাঝে মাঝে দেখা যায়। গোদাগাড়ির পদ্মা চরে দেখা যাবে মদনটাক পাখিটিকে, তবে বার দু'য়েক একে দেখা গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মেহেরচন্ডী এলাকায়। ছোট কেস্ট্রেল পদ্মা চরে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় ।

বাংলাদেশে তথ্য অপ্রতুল (data deficient) **প্রজাতিঃ** এই তালিকায় আছে বড় মোটা হাঁটু, উদয়ী মধুবাজ, কালোগলা মানিক জোড় ও বাংলা বাবুই। এদেরকে দেখা যায় পদ্মা নদীর চরগুলোতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উদয়ী মধুবাজকে দুই এক বছর শীতে দেখা গেছে। তবে ২০১৫ সাল থেকে উদয়ী মধুবাজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাসা করে বংশ বিস্তার করছে।

বাংলাদেশের এই পাখি প্রজাতিগুলি টিকে থাকার যুদ্ধে ক্রমাগত পিছু হঠছে। এদের সংরক্ষণ করা অতীব জরুরী। তা না হলে অচিরেই এরা হারিয়ে যাবে। এদের আবাস ও খাদ্য স্থানগুলো সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন এ ব্যাপারে আমাদের সবার সচেতনতা ।

সারণি ১. রাজশাহী জেলায় রেকর্ডকৃত বিপদাপন্ন পাখির তালিকা (IUCN, 2013)

বর্গ / গোত্র	বাংলা নাম (বৈজ্ঞানিক নাম)	ইংরেজী নাম	দর্শন স্থান (প্রাচুর্যতা)	IUCN ২০১৩ লাল তালিকায় অবস্থান
সন্তরক / হংস	ভুতি হাঁস (*Athya nyroca*)	Ferruginous Pochard/White-eyed Pochard	রা.বি. ক্যাম্পাস (বিরল, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
	টিকি হাঁস (*Anas falcate*)	Falcated Duck	পদ্মার চর (দূর্লভ, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
দীর্ঘজঙ্ঘ / অম্বুকুক্কুট	বাদামি ঝিল্লি (*Amaurornis akool*)	Brown Crake	পদ্মার চর (বিরল, এক জোড়া)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
দীর্ঘজঙ্ঘ / আরামুখ	কালো লেজ জৌরালি (*Limosa limosa*)	Black-tailed Godwit	পদ্মার চর (বিরল, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
	এশিয় ডওচার (*Limnodromus semipalmatus*)	Asian Dowitcher	পদ্মার চর (বিরল, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
দীর্ঘজঙ্ঘ / সৈকত	নদী টিটি [*Vanellus duvaucellii* (Lesson, 1826)]	River Lapwing	পদ্মার চর (বিরল, অল্প সংখ্যক)	বিপন্ন
	ৰড় মোটা হাঁটু (*Esacus recurvirostra*)	Great Stone Curlew/Great Thick Knee	পদ্মার চর (বিরল, দূর্লভ)	বাংলাদেশে তথ্য অপ্রতুল
দীর্ঘজঙ্ঘ / বাজ গোত্র	ধলা কাপাসি (*Circus macrourus*)	Pallied Harrier	পদ্মার চর (বিরল, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt (বাংলাদেশে তথ্য অপ্রতুল)
	বড় চিত্রা ঈগল/বড় গুটিমার (*Aquilla clanga*)	Greater Spotted Eagle	রা.বি. ক্যাম্পাস (বিরল, অল্প সংখ্যক), পদ্মার চর (দূর্লভ, অল্প সংখ্যক)	অতিবিপন্ন VUC1
	মাছ মুরাল (*Ichthyophaga ichthyaetus*)	Grey-headed Fish Eagle	রা.বি. ক্যাম্পাস (আবাসিক, অল্প সংখ্যক), মোহনপুর বিল ও পদ্মার চর (সচরাচর দৃশ্যমান, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
	উদয়ী মধুবাজ (*Pernis ptilorhynchus* Temminck,1821)	Oriental Honey Buzzard	রা.বি. ক্যাম্পাস (বিরল, এক জোড়া)	বাংলাদেশে তথ্য অপ্রতুল
দীর্ঘজঙ্ঘ / শ্যেণ	ছোট কেস্ট্রেল (*Falco naumanni*)	Lesser Kestrel	পদ্মার চর (দূর্লভ, অল্প সংখ্যক)	অতিবিপন্ন VUC1
দীর্ঘজঙ্ঘ / শরাটি	কালোমাথা কাস্তেচোরা (*Threskiornis melanocephalus*)	Black-headed Ibis	পচামাড়িয়া-পুঠিয়া (সচরাচর দৃশ্যমান, মাঝারি সংখ্যক) ঝিকরাপাড়া-গোদাগাড়ী (দূর্লভ, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
দীর্ঘজঙ্ঘ / অ্যান্হিঙ্গিডি	গয়ার (*Anhinga melanogaster*)	Oriental Darter/ Snake Bird	পচামাড়িয়া-পুঠিয়া (সচরাচর দৃশ্যমান, অল্প সংখ্যক), রা.বি. ক্যাম্পাস , পদ্মার চর, ঝিকরাপাড়া-গোদাগাড়ী (বিরল, অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় L R/nt
দীর্ঘজঙ্ঘ / দীর্ঘজঙ্ঘ	মদনটাক (*Leptoptilos javanicus*)	Lesser Adjutant	মেহেরচন্ডি-রাজশাহী (অতি বিরল)	অতিবিপন্ন VUC1
	সোনা জংঘা (*Mycteria leucocephala*)	Painted Stork	পদ্মার চর (দূর্লভ, মাঝারি ঝাঁক) পদ্মার চর (অল্প সংখ্যক)	বিপন্নপ্রায় LR/nt
	কালোগলা মানিক জোড় (*Ephippiorhynchus asiaticus*)	Black-necked Stork	পদ্মার চর (বিরল, অল্প সংখ্যক)	বাংলাদেশে তথ্য অপ্রতুল
দন্ডচারী / কুলিঙ্গ	ফিনের বায়া (*Ploceus megarhynchus* Hume, 1869)	Finn's Baya	ঝিকরাপাড়া-গোদাগাড়ী (বিরল, অত্যন্ত অল্প সংখ্যক)	বিপন্ন (বাংলাদেশে তথ্য নেই)
	বাংলা বাবুই / কালো বুক বাবুই (*Ploceus bengalensis*)	Black-breasted Weaver	পদ্মার চর (বিরল, ক্ষুদ্র ঝাঁক)	বাংলাদেশে তথ্য অপ্রতুল

চিত্র : রাজশাহী জেলায় দেখা ১৯ প্রজাতির বিপদাপন্ন পাখির ছবি।

১. ভুতি হাঁস (*Athya nyroca*)	২. টিকি হাঁস (*Anas falcate*)	৩. বাদামি ঝিল্লি (*Amaurornis akool*)	৪. কালো লেজ জৌরালি (*Limosa limosa*)
৫. লম্বা ঠোঁট চাহা (*Limnodromus semipalmatus*)	৬. নদী টিটি [*Vanellus duvaucellii* (Lesson, 1826)]	৭. বড় মোটা হাঁটু (*Esacus recurvirostra*)	৮. ধলা কাপাসি (*Circus macrourus*)
৯. বড় চিত্রা ঈগল/বড় গুটিমার (*Aquilla clanga*)	১০. মাছ মুরাল (*Ichthyophaga ichthyaetus*)	১১. উদয়ী মধুবাজ (*Pernis ptilorhynchus* Temminck,1821)	১২. ছোট কেস্ট্রেল (*Falco naumanni*)
১৩. কালোমাথা কাস্তেচোরা (*Threskiornis melanocephalus*)	১৪. গয়ার (*Anhinga melanogaste*)	১৫. মদনটাক (*Leptoptilos javanicus*)	১৬. সোনা জংঘা (*Mycteria leucocephala*)
১৭. কালোগলা মানিক জোড় (*Ephippiorhynchu asiaticus*)	১৮. ফিনের বায়া (*Ploceus megarhynchus* Hume, 1869)	১৯. বাংলা বাবুই/ কালো বুক বাবুই (*Ploceus bengalensis*)	

তথ্যসূত্রঃ

IUCN (International Union for Conservation of Nature) 2013. *Red List of Threatened Species*. version 2013.2.

প্রাণিবিদ্যা বিভাগে খেলাধূলা

ড. ইসতিয়াক মাহ্‌ফুজ
আহ্বায়ক, ক্রীড়া ও বিনোদন উপ-কমিটি

একটি প্রবাদের কথা বারবার মনে পড়ছে, তা হলো 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'। এটি যেমন সত্য, এই প্রবাদটিকে যদি একটু অন্যভাবে বলি যে, 'দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে, সাফল্য কোন না কোন সময় ধরা দেবেই', এটিও তেমনই সত্য হবে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার প্রতি অদম্য আগ্রহ ও সফলতা পাওয়ার প্রতি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, আমি বোধহয় একটু বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে বিভাগের বিভিন্ন খেলাধূলার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে আমি এতটুকু আশ্বস্ত হয়েছি যে, আমাদের বিভাগের খেলোয়াড়রা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের বিভাগের শিক্ষার্থীরা ২০১৬-১৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃবিভাগ গেমস্ কমিটি আয়োজিত নিম্নোক্ত খেলাগুলোতে অংশগ্রহণ করে, যেমন- ফুটবল, দাবা (ছাত্র), ক্যারম (ছাত্র-ছাত্রী), টেবিল টেনিস (ছাত্র) একক ও দ্বৈত এবং ব্যাডমিন্টন (ছাত্র-ছাত্রী) দ্বৈত।

ওই যে পূর্বে উল্লেখ করলাম, আমাদের বিভাগের খেলোয়াড়রা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। তারই একটি মনে রাখার মত উদাহরণ হলো, আন্তঃবিভাগ ব্যাডমিন্টন (ছাত্রী) দ্বৈত প্রতিযোগিতায় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের (শিক্ষার্থী) প্রমিলা দর্শন বিভাগকে হারিয়ে ২০১৬-১৭ তে চাম্পিয়ন হওয়া। যদিও ব্যাডমিন্টন (ছাত্র) দ্বৈত, দাবা, ক্যারম ও টেবিল টেনিসে আমরা সেই আশানুরূপ সাফল্য পাইনি। এই মূহুর্তে আরও একটি খুবই প্রচলিত প্রবাদের কথা মনে পড়ছে, তা হলো 'পরিশ্রম সাফল্যের চাবি-কাঠি'। হয়তোবা এই অসফলতার জন্য কিছুটা পরিশ্রমের ঘাটতি ও সময় স্বল্পতাকে দায়ী করা যেতে পারে। তাই আমরা আশায় বাঁধি বুক, ভবিষ্যৎ উত্তরণের দিকে তাকিয়ে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা পারবো এবং আমরা করবো।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বর্তমান ফুটবল দল বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে চৌকস ও সফল বলে আমার মনে হয়েছে। যদিও আমাদের সেই আকাশছোঁয়া সফলতা এখনও আসেনি। তবে বর্তমান দলটি নিয়ে আমাদের অনেক আশা-ভরসা, তার কারণ ২০১৬-১৭ সালে আন্তঃবিভাগ ফুটবলে আমাদের প্রাণপ্রিয় বিভাগ, যথাক্রমে ১ম ও ২য় রাউন্ডে ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট বিভাগকে ১-০ গোলে এবং প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাগকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ৩য় রাউন্ড খেলার সুযোগ করে নেয়। যদিও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ৩য় রাউন্ডে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাথে গোলশূন্য ড্র করে টাইব্রেকারে পরাজিত হয়, কিন্তু উক্ত খেলাগুলিতে আমাদের প্রাপ্তি এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা অনেক, যা আমাদের পরবর্তীকালের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

এই বিভাগের ফুটবল দলটির মত ক্রিকেট দলও ২০১৬-১৭ সালে আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট সফলতা দেখিয়েছে। আমাদের বিভাগ উক্ত প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ১ম ও ২য় রাউন্ডে ইনফরমেশান এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগদ্বয়কে পরাজিত করে ৩য় রাউন্ডে খেলার সুযোগ করে নেয়, যা বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে একটি অনন্য অর্জন বলে আমার মনে হয়েছে। যদিও ৩য় রাউন্ডে ফাইন্যান্স বিভাগের সাথে পরাজিত হয়ে আমাদের অগ্রগতি ওই বছরের মত স্তিমিত হয়ে যায়। উক্ত খেলাটি থেকে পাথেয় হিসেবে ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে পরবর্তী বছরে শোধরানোর জন্য খেলোয়াড়দের অন্তরে একটি দৃঢ়তার জন্ম দিবে, যা আমাদের অগ্রগতিকে তরান্বিত করবে বলে আমি মনে করি।

আন্তঃবিভাগ প্রতিযোগিতা ছাড়াও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এবং এর শিক্ষার্থীরা প্রতি বছরই আন্তঃবর্ষ ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেখানে বিভাগের শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতা সকলকে অনুপ্রেরণা যোগায় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অবশেষে এটুকু বলতে হয়, প্রতিটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিভাগের সভাপতি, সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সর্বোপরি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রাণ, একগুচ্ছ উৎসাহী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা এবং খেলাধূলার প্রতি তাদের প্রচন্ড আগ্রহ, বিভাগের যেকোন খেলার পিছনে একটি শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে অবদান রেখে চলেছে।

মানব হিমোগ্লোবিনের বংশগতি

প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম

হিমোগ্লোবিনের গঠন (structure of haemoglobin)

মানব হিমোগ্লোবিনের বংশগতি (Genetics of human haemoglobin) নিয়ে আলোচনার শুরুতে এর গঠন সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। হিমোগ্লোবিন, যেটি সংক্ষেপে Hb প্রতীক দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে, একটি ধাতুঘটিত আমিষ (metalloprotein)। এটি রক্তের লোহিত কণিকায় (RBC) বিদ্যমান এবং এটি কোষে অক্সিজেন বহনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ। মানুষের স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন শতকরা প্রায় ৬ ভাগ হিম (haeme) এবং বাকী প্রায় ৯৬ ভাগ গ্লোবিন (globin) সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি হিম চারটি লৌহ (Fe^{++}) অণুর ও প্রোটোপরফাইরিন (protoporphyrin) ঘটিত যৌগের একটি প্রসথেটিক গ্রুপ (prosthetic group)। আর প্রতিটি গ্লোবিন চারটি পলিপেপটাইড চেইন (polypeptide chain) -এর একটি গুচ্ছ (tetramers), যাতে রয়েছে দুটি আলফা (α_1, α_2) ও দুটি বেটা (β_1, β_2) চেইন। প্রতিটি আলফা ও বেটা পলিপেপটাইড চেইনে রয়েছে যথাক্রমে ১৪১টি ও ১৪৬টি করে এ্যামিনো এসিড। অর্থাৎ এক একটি গ্লোবিন অণু মোট ৫৭৪টি করে এ্যামিনো এসিড দিয়ে গঠিত। হিমোগ্লোবিন রক্তে লোহিত কণিকায় শ্বসন রঞ্জক (respiratory pigment) হিসেবে কাজ করে এবং এটি কোষের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন (oxyhaemoglobin) তৈরী করে। হিমোগ্লোবিনোমিটার (haemoglobinometer) যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমান মাপা হয়। লিঙ্গভেদে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর প্রতি ডেসিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান যথাক্রমে প্রায় ১৩.৫-১৭.৫ গ্রাম ও ১২.০-১৫.৫ গ্রাম। পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক একটি হিমোগ্লোবিন অণুর (HbA) আণবিক ওজন ৬৪,০০০ ডাল্টন (Da), যেটি নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী জীন রয়েছে ব্যক্তির ১১ নম্বর ক্রোমোজোমে। নিচের তিনটি চিত্রে মানুষের হিমোগ্লোবিন অণুর গঠন দেখানো হয়েছে।

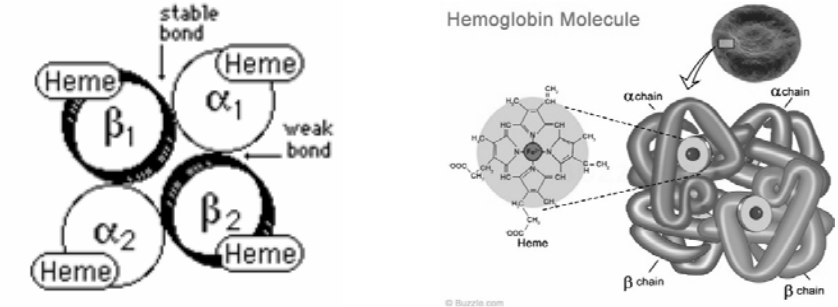

চিত্র ১. একটি হিমোগ্লোবিন অণুতে হিম ও আলফা-বেটা চেইনদ্বয়ের আপেক্ষিক অবস্থান।

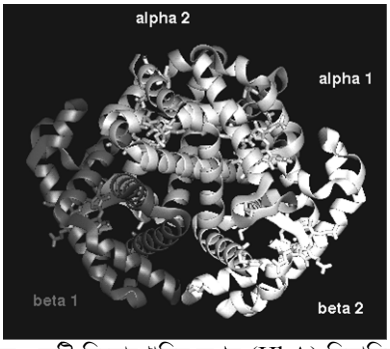

চিত্র ২. স্বাভাবিক একটি হিমোগ্লোবিন অণুর (HbA) ত্রিমাত্রিক (3D) গঠন।

মানুষের হিমোগ্লোবিনের ধরণ (Types of human haemoglobin)

সফল গর্ভাবস্থায় ভ্রুণ থেকে ছয় মাসের পর পর্যন্ত মানুষে চার ধরনের হিমোগ্লোবিন তৈরী হয় (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)। গর্ভধারণ (conseption) থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ভ্রুণীয় হিমোগ্লোবিন (HbE), ৮ সপ্তাহের পর থেকে ভ্রুণের ছয় মাস বয়স পর্যন্ত ফিটাল হিমোগ্লোবিন (HbF) এবং ছয় মাসের পর থেকে পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিন (HbA) ও মাইনর পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিন (HbA_2) তৈরী হয়। ভ্রুণীয় হিমোগ্লোবিন জেটা২ ও ইপ্সিলন২ ($\zeta_2\varepsilon_2$) পলিপেপটাইড চেইন সমন্বয়ে গঠিত। আবার ফিটাল হিমোগ্লোবিনে রয়েছে আলফা২ ও গামা২ ($\alpha_2\gamma_2$) পলিপেপটাইড চেইন। এই হিমোগ্লোবিনের গামা চেইনটি আবার দুধরনের হতে পারে, যথা: $G\gamma_2$ I $A\gamma_2$। পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিনের অণুতে রয়েছে আলফা২ ও বেটা২ ($\alpha_2\beta_2$) পলিপেপটাইড চেইন, আর মাইনর পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিনের অণুতে থাকে আলফা২ ও ডেলটা২ ($\alpha_2\delta_2$) পলিপেপটাইড চেইন। রক্তে পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিনের পরিমান প্রায় ৯৭-৯৮%, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রায় ০.৫% ফিটাল হিমোগ্লোবিন; রক্তের বাকী প্রায় ২-৩ শতাংশ হচ্ছে

মাইনর পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিনের আণবিক ওজন ৬৪,০০০ ডাল্টন, কিন্তু ভ্রুণীয়, ফিটাল ও মাইনর পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিনের আণবিক ওজন ৬৭,০০০ থেকে ৭০,০০০ ডাল্টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সারণি ১. মানুষের বিভিন্ন ধরনের হিমোগ্লোবিন।

Haemoglobin types	Polypeptide chain combinations
1. Embryonic haemoglobin (HbE) (conception-8 weeks)	$\zeta_2\varepsilon_2$
2. Foetal haemoglobin (HbF) (>8 weeks-6 months)	$\alpha_2\gamma_2$ (two types $G\gamma_2$ & $A\gamma_2$)
3. Adult haemoglobin (HbA) (> 6 months) ~97-98% HbA + traces of HbF (0.5%)	$\alpha_2\beta_2$
4. Minor adult haemoglobin (HbA_2) (> 6 months); ~2-3%	$\alpha_2\delta_2$

উৎস: Klug & Cummings, 2003

স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের প্রকারভেদ (Variants of normal haemoglobin)

মানুষের স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিন (HbA) অণুর মিউটেশনের কারণে এ পর্যন্ত ৩০০টিরও বেশী প্রকারভেদ আবিস্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান তিনটি হলো HbS, HbC I HbG। এগুলো গুণিতক এলিল (multiple alleles) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এলিলগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক হলো সহ-প্রকটতা (codominant) ধরনের, যেমন HbA= HbS, HbA=HbC, HbA= HbG ইত্যাদি। হিমোগ্লোবিনের প্রকারভেদগুলো মানুষের কয়েকটি মারাত্মক রোগ-ব্যাধির জন্য দায়ী। প্রবন্ধের শেষের দিকে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হিমোগ্লোবিন প্রকারভেদের রসায়ন (Chemistry of haemoglobin variants)

প্রধানত নিচে বর্ণিত চারটি আবিস্কার হিমোগ্লোবিন প্রকারভেদের রসায়ন উন্মোচনে সাহায্য করেছে।

প্রথমত ১৯২৫ সালে কুলি'র থ্যালাসিমিয়া (Cooley's thalassaemia) আবিস্কৃত হয়; পরবর্তীতে জানা যায় যে, হিমোগ্লোবিন প্রকরণ HbC রোগটির জন্য দায়ী। দ্বিতীয়ত, সিক্‌ল-কোষ রক্তস্বল্পতা (sickle-cell anaemia) রোগটি আবিস্কৃত হয় ১৯৪০ সালে; এবং রোগটি হিমোগ্লোবিন HbS প্রকরণের জন্য হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির (CIT) বিজ্ঞানী পলিং (Pauling) এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ১৯৪৯ সালে প্রথম দেখান যে, হিমোগ্লোবিন HbA ও HbS প্রকরণ দু'টি তাদের ইলেক্ট্রোফোরেটিক মোবিলিটি (electrophoretic mobility)-র কারণে আলাদা। কারণ HbA অণু ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হওয়ায় এটি ইলেক্ট্রোফোরেসিস প্রক্রিয়ায় ধণাত্মক মেরুর দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু HbS অণু কোন চার্জযুক্ত নয় (নিউট্রাল) বিধায় সেটি অপেক্ষাকৃত ধীরে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৩)। চতুর্থত, ইনগ্রাম (১৯৫৭) এবং হান্ট ও ইনগ্রাম (১৯৫৮, ১৯৬০) রাসায়নিক যৌগের ফিঙ্গার প্রিন্টিং (finger printing technique) কৌশল প্রয়োগ করে দেখান যে, স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন HbA এর অন্যান্য প্রকরণগুলো (যেমন HbS, HbC ও HbG) প্রকৃতপক্ষে পয়েন্ট মিউটেশনজনিত কারণে বেটা চেইনের শুধুমাত্র একটি এ্যামিনো এসিডের পরিবর্তনের জন্য হয়ে থাকে (সারণি ২; চিত্র ৪-৫)।

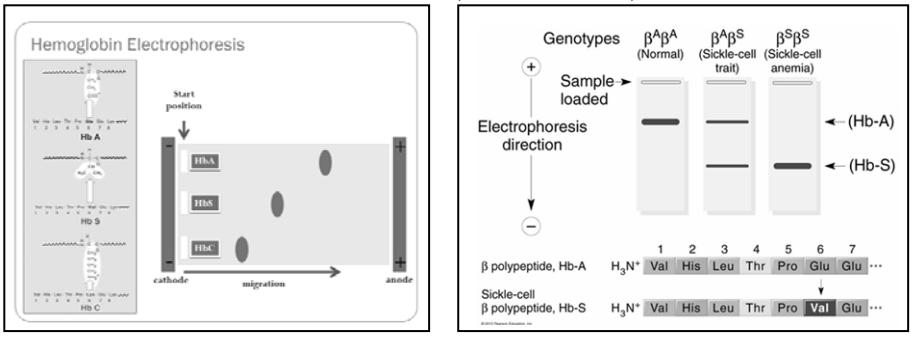

চিত্র ৩. ইলেক্ট্রোফোরেসিস প্রক্রিয়ায় হিমোগ্লোবিন প্রকারভেদের রাসায়নিক ভিন্নতা প্রদর্শন

HbA ও এর প্রকরণদের আণবিক জীববিদ্যা (Molecular biology of HbA and its variants)

কিভাবে একটি স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিন অণু (HbA) HbS, HbC কিংবা HbG অণুতে রূপান্তরিত হয় সেটি নিচের সারণি ২-এ দেখানো হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বেটা চেইনের ষষ্ঠ এ্যামিনো এসিড গ্লুটামিক এসিডের পরিবর্তে ভ্যালিন উৎপাদিত হলে HbS, লাইসিন উৎপাদিত হলে HbC এবং সপ্তম এ্যামিনো এসিড গ্লুটামিক এসিডের পরিবর্তে গ্লাইসিন উৎপাদিত হলে HbG অণু উৎপাদিত হয়। আণবিক পর্যায়ে এই পরিবর্তনগুলোর জন্য ক্রোমোজমে DNA অণুর ট্রিপ্লেট কোডন (triplet codon) ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাইটোপ্লাজমে mRNA অণুর ট্রান্সলেশন পদ্ধতি শেষে কাঙ্খিত এ্যামিনো এসিডগুলোর জন্য সংকেত প্রেরিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, HbA ও HbS অণুদ্বয়ে উপরোক্ত আণবিক কৌশল নিচের ৪ নম্বর চিত্রে দেখানো হলো।

সারণি ২. স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিন অণু (HbA) ও এর তিনটি প্রকরণের (HbS, HbC ও HbG) বেটা চেইনে ১৪৬টি এ্যামিনো এসিডের প্রথম আটটির পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনগুলো দেখানো হয়েছে।

Amino acids in the β-chain	HbA	HbS	HbC	HbG
1. Valine	Valine	Valine	Valine	Valine
2. Histidine	Histidine	Histidine	Histidine	Histidine
3. Leucine	Leucine	Leucine	Leucine	Leucine
4. Threonine	Threonine	Threonine	Threonine	Threonine
5. Proline	Proline	Proline	Proline	Proline
6. Glutamic acid	Glutamic acid^{-}	Valine^{0}	Lysine^{+}	Glutamic acid^{-}
7. Glutamic acid	Glutamic acid^{-}	Glutamic acid^{-}	Glutamic acid^{-}	Glycine^{0}
8. Lysine	Lysine	Lysine	Lysine	Lysine

+= ধনাত্মক চার্জ; -= ঋণাত্মক চার্জ; 0 = নিউট্রাল চার্জ।

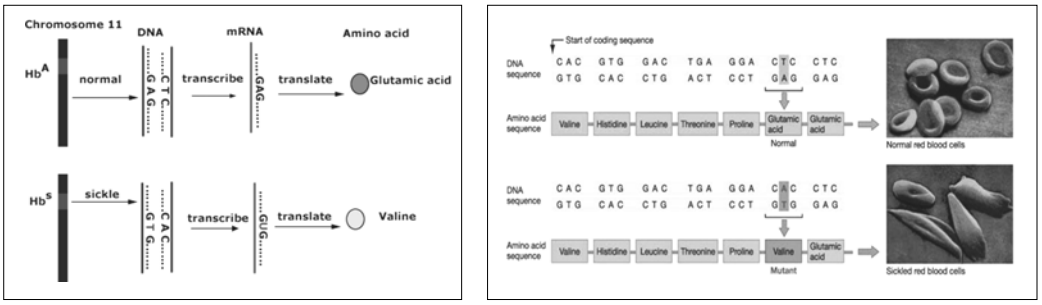

চিত্র ৪. স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক হিমোগ্লোবিন (HbA)-এর জন্য দায়ী জেনেটিক কোড (CTC), যা গ্লুটামিক এ্যাসিড উৎপাদন করে, এবং উৎপাদিত স্বাভাবিক লোহিত কণিকা (উপরের সারি); সিক্‌ল-কোষ হিমোগ্লোবিন (HbS)-এর জন্য দায়ী জেনেটিক কোড (CAC), যা ভ্যালিন উৎপাদন করে, এবং উৎপাদিত কাস্তে-আকৃতির লোহিত কণিকা।

জীন মিউটেশনে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে? (What actually happens during the gene mutation?)

পয়েন্ট মিউটেশনের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আমরা এখানে HbA থেকে HbS অণু প্রকরণের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। উপরে বর্ণিত চিত্র ৪-এ লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো যে, HbA অণুর DNA ট্রাইনিউক্লিওটাইড (C**T**C) টি C**A**C -তে রূপান্তরের কারণেই মূলত HbS অণুর উৎপত্তি ঘটিয়েছে। অর্থাৎ, একটি থাইমিন (**T**) অণু একটি এ্যাডিনিন (**A**) অণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। জীন মিউটেশনের ভাষায় এটি হচ্ছে ট্রান্সভার্শন (transversion)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নাইট্রোজেন বেইস থাইমিন হচ্ছে একটি পাইরিমিডিন (pyrimidine), কিন্তু নাইট্রোজেন বেইস এ্যাডিনিন হলো পিউরিন (purine) গ্রুপের। অর্থাৎ, এখানে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটি ঘটেছে একটি পাইরিমিডিনের সঙ্গে একটি পিউরিনের। কিন্তু পিউরিন-পিউরিনের মধ্যে কিংবা পাইরিমিডিন-পাইরিমিডিনের মধ্যে এধরনের প্রতিস্থাপন ঘটলে জীন মিউটেশনের ভাষায় সেটিকে বলা হয় ট্রানজিশন (transition)। চিত্র ৫-এ ব্যাপারটি দেখানো হয়েছে।

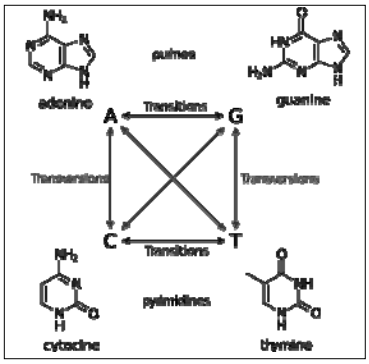

চিত্র ৫. জীন মিউটেশনের দুটি প্রক্রিয়া ট্রানজিশন ও ট্রান্সভার্শন; পিউরিন-পিউরিন কিংবা পাইরিমিডিন-পাইরিমিডিনদ্বয়ের মধ্যে প্রতিস্থাপনকে ট্রানজিশন কিন্তু পিউরিন-পাইরিমিডিনদ্বয়ের মধ্যে প্রতিস্থাপনকে ট্রান্সভার্শন বলা হয়।

জীনের একটি নতুন ধারণা (A new concept of gene)

উপরে আলোচিত মানব হিমোগ্লোবিন প্রকারভেদের বিস্তারিত রসায়ন উন্মোচন জীনের একটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে। আমরা জানি, মেন্ডেল (১৮৬৫) তাঁর মটরশুঁটি নিয়ে করা গবেষণা ও ফলাফলের ভিত্তিতে একটি জীন (ফ্যাক্টর)-একটি বৈশিষ্ট্য মতবাদের (one gene (factor)-one

character hypothesis) কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। পরবর্তীতে আলফ্রেড গ্যারড (১৯০৯) মানুষের সহজাত জন্ম বিপাকীয় ত্রুটির (inborn metabolic errors) গবেষণায় একটি জীন-একটি এনজাইম মতবাদের (one gene-one enzyme hypothesis) স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। এরপর ১৯৪১ সালে বীড্‌ল ও ট্যাটাম (Beadle & Tatum) বিজ্ঞানীদ্বয় *Neurospora* (ছত্রাক) নিয়ে জৈব-রাসায়নিক গবেষণায় একটি জীন-একটি প্রোটিন মতবাদ (one gene-one protein hypothesis) উপস্থাপন করেন। পরিশেষে, মানুষের হিমোগ্লোবিনের আণবিক বিশ্লেষণে হান্ট ও ইনগ্রাম (১৯৬০) একটি জীন-একটি এ্যামিনো এসিড মতবাদটির (one gene-one amino acid hypothesis) সূচনা করেন। তাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সময়ের বিবর্তনে এবং তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জীন সম্পর্কীত ধারণারও পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

হিমোগ্লোবিনঘটিত ব্যাধি (Haemoglobin disorders or haemoglobinopathies)

এবার আমরা মানুষে হিমোগ্লোবিনঘটিত দু'টি মারাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে জানবো। সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বা সিকি মিলিয়ন মানুষ হিমোগ্লোবিনঘটিত রোগে মারা যায়। মূলত HbS অণুর গঠনজনিত ত্রুটি এবং HbC অণুর সংশ্লেষজনিত ত্রুটির কারণ যথাক্রমে সিক্‌ল-কোষ রক্তস্বল্পতা ও বেটা-থ্যালাসিমিয়া রোগ মানুষের হয়ে থাকে। নিচে এ দু'টি রোগের খুঁটিনাটি কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।

বেটা-থ্যালাসিমিয়া (β-thalassaemia)

এই রোগ দু'ধরনের হতে পারে: যথা, (১) বেটা-থ্যালাসিমিয়া মেজর বা Cooley's থ্যালাসিমিয়া ও (২) বেটা-থ্যালাসিমিয়া মাইনর বা বাহক থ্যালাসিমিয়া। রোগী দায়ী জীনের হোমোজাইগট (Hb^CHb^C homozygote) অবস্থার কারণে প্রথমটিতে এবং জীনের হেটারোজাইগট (Hb^AHb^C heterozygote) অবস্থার কারণে দ্বিতীয়টিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বেটা-থ্যালাসিমিয়ার লক্ষণসমূহ (Signs and symptoms of β-thalassaemia)

(১) বেটা-থ্যালাসিমিয়া মেজর-এ আক্রান্ত শিশু জন্মের প্রথম বছর থেকেই রক্ত সঞ্চালন-নির্ভর (blood transfusion-dependent) মারাত্মক রক্তস্বল্পতার (severe anaemia) শিকার হয়। রোগটি ১৯২৫ সালে কুলি'র থ্যালাসিমিয়া নামে প্রথম সনাক্ত করা হয়। রোগীর রক্তে শুধুমাত্র বিকৃত আকৃতির লোহিত কণিকার উপস্থিতি রয়েছে, এদের মুখমন্ডল ও করোটি অস্বাভাবিক আকৃতির হয়ে থাকে (চিত্র ৬)। সার্বক্ষণিক ক্লান্তি, দূর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, হলুদাভ গাত্রবর্ণ (জন্ডিসের লক্ষণ), হাত-পায়ের হাড়ের বিকৃতি (চিত্র ৭) এবং বাধাগ্রস্থ শারীরিক বৃদ্ধি (stunted growth) বেটা-থ্যালাসিমিয়া মেজর রোগীর অন্যতম ত্রুটিলক্ষণ। এদের সার্বক্ষণিক রক্তস্বল্পতা রক্তবর্ধক ওষুধে সারে না এবং এরা সাধারণত জীবনের বিলম্বিত কৈশোর (late teens) কিংবা প্রারম্ভিক কুড়ি (early twenties) বয়সের মধ্যে মারা যায়।

(২) অপরপক্ষে, শিশু জন্মের মাস ছয়েক পর থেকেই বেটা-থ্যালাসিমিয়া মাইনর রোগীর রক্তস্বল্পতা প্রকাশ পেতে থাকে। এদের যকৃত ও প্লীহা বড় আকৃতির, রক্তে স্বাভাবিক ও বিকৃত উভয় আকৃতির লোহিত কণিকা বিদ্যমান থাকে এবং এদের রক্তে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী সংখ্যক শ্বেত কণিকার উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়। সুস্থতার জন্য এদের প্রায়শ রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন পড়ে। ক্লান্তি ও খিটখিটে মেজাজ, পৌনঃপণিক সংক্রমণ, বিশেষ করে মুখমন্ডলের হাড়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিকৃতি (*caput quadratum*) ও প্রায়-রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে মুখমন্ডল, বাধাগ্রস্থ শারীরিক বৃদ্ধি এবং শারীরবৃত্তীয় নানাবিধ জটিলতা এই রোগের উল্লেখযোগ্য ত্রুটিলক্ষণ।

চিত্র ৬. বেটা-থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত একটি শিশু (বামে), যার রক্তে বিকৃত ও স্বাভাবিক উভয় লোহিত কণিকা বিদ্যমান (মাঝে), এবং বেটা-থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত একজন কিশোরী (ডানে)।

সিক্‌ল-কোষ রক্তস্বল্পতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of sickle-cell anaemia)

সিক্‌ল-কোষ রক্তস্বল্পতা রোগটি ১৯৪০ সালে আবিস্কৃত হয়। এটি একটি জীন বা পয়েন্ট মিউটেশনের সুন্দর উদাহরণ, যেখানে হিমোগ্লোবিন অণুর বেটা চেইনের ষষ্ঠ এ্যামিনো এসিড (গ্লুটামিক এসিড) ভ্যালিন নামক অপর একটি এ্যামিনো এসিড দ্বারা, প্রতিস্থাপিত হয়। রোগটির দুধরনের ফিনোটাইপ রয়েছে; যথাঃ সিক্‌ল-কোষ হোমোজাইগট ও সিক্‌ল-কোষ হেটারোজাইগট। সিক্‌ল-কোষ হোমোজাইগট রোগীর দেহে শুধুমাত্র কাস্তে-আকৃতির (sickle-shaped) লোহিত কণিকা বিদ্যমান। ফলে রোগী মারাত্মক রক্তশূন্যতা ও জন্ডিসে ভোগে। এদের দেহে প্রায়শ জ্বর থাকে, যকৃত ও প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পেটে ও হাড়ে ব্যথা অনুভুত হয়. হাত-পা ফোলা থাকে (hand-foot syndrome) এবং বেশীরভাগ

ক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির আগেই এরা মৃত্যুবরণ করে। সিক্‌ল-কোষ হোমোজাইগট-এর তুলনায় সিক্‌ল-কোষ হেটারোজাইগট রোগী কিছুটা ভাল অবস্থায় দিন কাটায়। এদের রক্তে স্বাভাবিক ও কাস্তে-আকৃতির লোহিত কণিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা আপাত সুস্থ থাকে, তবে অক্সিজেনের স্বল্পতায় (under reduced O_2 tension) যেমন, বিমান ভ্রমণে কিংবা পর্বতারোহণে, মাঝে-মধ্যে পেট ও হাত-পায়ে ব্যথা, বাত, নিউমোনিয়া, হিমাচুরিয়া (haematuria) বা প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়। তাছাড়া রোগীর প্রায়ই রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) প্রয়োজন পড়ে।

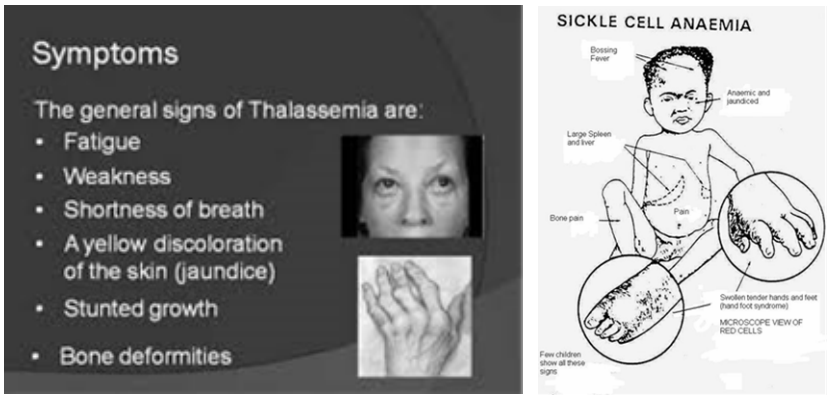

চিত্র ৭. বেটা-থ্যালাসিমিয়া (বামে) ও সিক্‌ল-কোষ এ্যানিমিয়া রোগীর কয়েকটি প্রধান ক্রটিলক্ষণ।

হিমোগ্লোবিন প্রকারভেদের সুবিধাদি (Advantages of haemoglobin variants)

উপরোক্ত হিমোগ্লোবিনঘটিত ব্যাধি সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হিমোগ্লোবিন অণুর সামান্যতম গাঠণিক কিংবা কার্যকারীতার পরিবর্তন মানব স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই ক্ষতিকর প্রভাব থাকা সত্বেও হিমোগ্লোবিনের অন্তত দুটি প্রকারভেদ (HbS I HbC) পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠিতে উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। পৃথিবীর ম্যালেরিয়া বেল্ট নামে পরিচিত অঞ্চলগুলো, যেমন পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকা, মাদাগ্যাস্কার, সিরিয়া, গ্রীস, ইতালী, আরব উপদ্বীপ ও ভূ-মধ্যসাগরীয় সমতল এলাকার জনগোষ্ঠিতে সিকল্‌-কোষ এ্যানিমিয়া ও থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত বাহকের সংখ্যা স্বাভাবিক অ-ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির তুলনায় অনেকগুণ বেশী। এ সংক্রান্ত গবেষণার উপাত্তে দেখা যায়, ওইসব এলাকায় প্রায় ৮০ শতাংশ শিশু ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। আবার হোমোজাইগট সিকল্‌-কোষ এ্যানিমিক (Hb^SHb^S) ও থ্যালাসিমিয়া মেজর (Hb^CHb^C) ব্যক্তিবর্গের প্রায় সবাই (১০০ শতাংশ) ভয়াবহ রক্তশূন্যতায় পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগেই মারা যায়। কিন্তু মজার বিষয় হলো, হেটারোজাইগট সিক্‌ল-কোষ বাহক (Hb^AHb^S) ও থ্যালাসিমিয়া মাইনর (Hb^AHb^C) ব্যক্তিবর্গ বিশ্বের ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকাগুলোতে মারণ (fatal or lethal) ম্যালেরিয়া জীবাণুর (*Plasmodium falciparum*) মারাত্মক প্রভাবকে সামলে নিয়ে দিব্বি বেঁচে থাকে। এর প্রধান কারণ হলো ম্যালেরিয়ার জীবাণু ক্রটিযুক্ত (distorted) লোহিত কণিকায় ঠিকমত বৃদ্ধি পেতে পারেনা। তাই, এখানে আমরা হেটারোজাইগট ফিনোটাইপের স্বপক্ষে প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রত্যক্ষ করি।

তথ্যসুত্রঃ

Burns, JW 1980. The Science of Genetics (4th edn). MacMillan Publishing Co., Inc., New York.

Emery, AEH & Mueller, RF 1992. Elements of Medical Genetics. ELBS with Churchill Livingstone, Longman Group, UK Ltd.

Gardner, EJ, Simmons, MJ & Snustad, DP 1991. Principles of Genetics (8th edn). John Wiley & Sons, Inc., Singapore.

Klug, WS & Cummings MR 2003. Concepts of Genetics (7th edn). Pearson Education (Singapore) Pvt. Ltd, New Delhi.

Levine, L 1980. Biology of the Gene. The C. V. Mosby Co., USA.

Novitski, E 1977. Human Genetics. MacMillan Publishing Co., Inc., New York.

Winchester, AM 1966. Genetics: A Survey of the Principles of Heredity (3rd edn). Oxford & IBH Publ. Co., New Delhi.

www.wikipedia.com & other internet sources (2017).

আবাস ভেদে তিনটি পাখি

প্রফেসর ড. এ. এম. সালেহ রেজা ও প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন

বরেন্দ্রভূমির পাখি মোটাহাঁটু

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বের হতে হয় বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের প্রাণী বৈচিত্র্যের সাথে পরিচিত হতে। সে কারণে যেমন যাওয়া হয় কক্সবাজার-টেকনাফ-সেন্টমার্টিনস্-পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের চা বাগান-তামাবিল-মাধবকুন্ড, বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর, চলনবিল এলাকায়, তেমনি বরেন্দ্রভূমির প্রায় সম্পূর্ণ এলাকাতেও। বরেন্দ্রভূমির প্রাণী বৈচিত্র্য দেখাতে প্রায় প্রতিবছর যাওয়া হয় 'বাবু ডাইং'। বাবু ডাইং এখনও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরে রাখলেও পিকনিক পার্টি পর্যটন শিল্পের প্রসারণের অপরিকল্পিত ব্যবস্থপনা ওখানকার পরিবেশকে বিনষ্ট করছে। বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় কিছু পশু-পাখি বাবু ডাইং-এ এখনও আছে, তবে সেগুলি পড়ছে হুমকির মুখে।

যে পাখিটির কথা প্রথমে লিখছি সেটি পৃথিবীতে বেশ ভাল সংখ্যায় থাকলেও বাংলাদেশে এদের দেখা পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। শুষ্ক এলাকায় এর বাস। বাংলাদেশ ছাড়াও ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় এর বিস্তৃতি। দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (Ciconiformes) পানবিক গোত্রের (Burhinidae) পাখি এটি। এই গোত্রের পাখিদের ডানা ও পা লম্বা, ঠোঁট মাথার তুলনায় ছোট কিন্তু ভারি গড়নের। এই গোত্রে দুটি গণে মোট ৯টি প্রজাতির পাখি আছে। বাংলাদেশের দুটি গণেরই একটি করে প্রজাতি আছে। পানবিক গোত্রের পাখিদের গণ দু'টি হচ্ছে, পানবিক (*Burhinus*) ও উচ্চশির (*Esacus*)|

২০১১ সালে বাবু ডাইং-এ দেখা পাওয়া গেল পানবিক গণের প্রজাতিটিকে (চিত্র ১), যার বৈজ্ঞানিক নাম *Burhinus oedicnemus* (Linneaus)। সহজে কি চোখে পড়ে? পরিবেশের সাথে মিশে যাওয়া রঙ দিয়ে সাজানো দেহ। ভয় পেলে ওরা এমনভাবে চুপচাপ মাটির সাথে মিশে পড়ে থাকবে যে খুব কাছে না গেলে চোখে পড়বে না। *Burhinus* গণে সাতটি প্রজাতি আছে, বাংলাদেশে মাত্র একটি, যার নাম *B. oedicnemus*। পাখিটির বাংলা নাম ইউরেশিয় মোটাহাঁটু, ছোট শিলাবাটান, খরমা; ইংরেজি নাম Eurasian Stone-Curlew, Eurasian Thick-Knee, Stone-Curlew ও Stone Plover। লম্বা পায়ের হাঁটুটা বেশ মোটা হওয়ায় 'মোটাহাঁটু' নামটা বেশ মানানসই হয়েছে। পাখিটির প্রজাতি নাম গ্রীক শব্দাবলী Oideo (ফোলা) ও Knee (হাঁটু) থেকে হয়েছে *Oedicnemus*।

পাখিটির দৈর্ঘ্য ৪১ সে.মি., ডানা ২১ সে.মি., ঠোঁট ৪.৩ সে.মি., পা ৮.১ সে.মি., লেজ ১০ সে.মি.। দেহের উপরিভাগ বালি রঙ, তাতে হাল্কা হলুদ আভা; তলদেশ বালি-লালচে-মেটে রঙের। পিঠের দিকের প্রতিটি পালকের ধূসর লালচে-পাটকিলে, তার উপর কালো কালো টান, তার ভিতরে সাদা ছোপ। চোখের উপরে-মোটা কালো টান তার নিচে সরু সাদা ভ্রুলেখা, চোখের নিচে হাল্কা হলুদ টান। ডানার পাশ পাটকিলে, ডানার উপরে সাদা-কালো লম্বা টান। লেজ ছাই-পাটকিলে, মাঝখানের ২-৪টা পালক ছাড়া বাকি পালকের আগাটা কালচে তার উপর সরু সাদা টান। গলার উপর ও লেজের তলায় ফিকে লালচে-হলুদের ছোপ। বুকের উপর পাটকিলে ছিটে-ফোঁটা রঙ আছে। বড় ড্যাবডেবে গোল চোখের মণি হলুদ; লম্বা পা ও পায়ের পাতা সবুজ-হলুদ। ঠোঁটের গোড়া হলুদ, আগাটা সবুজ হলুদের সাথে কালচে মেশানো। স্ত্রী ও পুরুষ পাখির রঙ একই রকম। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ডানার উপরের টানা দাগগুলি ও সাদা ভ্রুলেখা নাই। এদের পায়ের হাঁটু মোটা; পিছনের আঙুল নেই; মাঝের আঙুলটা একটু চওড়া। পায়ের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এরা ভাল দৌড়াতে পারে।

প্রধানত শুষ্ক অঞ্চলে এদের বাস। তবে পাথুরে পাহাড়, নদীর শুকনো খাত, ঝোপ-ঝাড়, ফল বাগান ও গাছপালায় ছাওয়া গ্রাম্য এলাকাতেও এদের দেখা যায়। সাধারণত জোড়ায় বিচরণ করলেও ছোট ছোট দলেও এরা ঘোরাফেরা করে। রাতে, ভোরে ও সন্ধ্যায় এদের দেখা যাবে খাবারের খোঁজে চরে বেড়াতে। দিনের বেলা ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে ঝোপ-ঝাড়ে। তবে প্রয়োজনে যে দিনের আলোয় চরে বেড়ায় না তা নয়। তা না হলে সেদিন বাবু ডাইং-এ পাখিটিকে আমরা দেখতে পেতাম না। মোটা হাঁটুর খাদ্য তালিকায় আছে কীট-পতঙ্গ, শামুক, ছোট সরীসৃপ-ইঁদুর, শক্ত ছোট বীজ, বালু ও কাঁকরের কণা। তীব্র স্বরে এরা ডাকে 'পিক পিক পিক পিক' আর শেষ করে 'পিক-উইক, পিক-উইক' শব্দে। ভোরে সন্ধ্যায় মোটাহাঁটুর ডাক শোনা যায়। তবে কথিত আছে যে, চাঁদনী রাতে সারারাত ধরে ডাকে এরা।

মোটাহাঁটুর প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি-আগস্ট। ঘাস বা পাথরের নীচে মাটিতে বাসা বাঁধে। এছাড়া ঝোপের নীচে, শুকনো নদীর চরে, আম বাগানে, অচষা জমিতেও বাসা করে। মাটির ঐ অপরিসর গর্তটার চারপাশ কিছু মাটির ছোট ঢেলা-নূড়ি দিয়ে ঘিরে দেয়। সেই বাসায় স্ত্রী পাখি ২-৩টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ মেটে বা লালচে-হলুদ, তার উপর কালচে পাটকিলে অথবা বেগুনি অথবা লালচে-হলুদ ও ধূসর রঙা ছোট দেয়া। ডিমের আকার ৪.৭×৩.৪ সে.মি.। সাধারণতঃ স্ত্রী পাখি ডিমে তা দেয়, তাছাড়া বাসা বাঁধা, ছানাদের লালন-পালনে পুরুষ পাখিও সাহায্য করে।

মোটাহাঁটুর পাখিটি অদ্ভুত রকম দেখতে। এর আচার-আচরণও বেশ মজার। শত্রুর চোখ ফাঁকি দিতে পা গুটিয়ে মাটির সাথে দেহ মিশিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে অনেকক্ষণ। বাসায় ডিমে তা দিতে থাকা স্ত্রী পাখিকে বা ডিমগুলিকে হঠাৎ করে দেখা যায় না, এমনই এদের শরীরের ও ডিমের রঙ। এমনিতেই বাংলাদেশে এদের দেখা পাওয়া যায় মাঝে-মাঝে, তার উপরে বাসস্থান সংকটে পড়েছে। আমাদের ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, সেদিন হঠাৎ করেই একটার দেখা পেয়েছিলাম। বাবু ডাইং-এর ভেতর দিকে মোটাহাঁটু বাস করে এটা বোঝা যাচ্ছে। তবে মানুষের উৎপাতে এটি উৎখাত হয়ে যাবার ভয় রয়েছে।

চিত্র ১. মোটাহাঁটু (বাবু ডাইং থেকে তোলা ছবি)।

বিলের পাখি বিল বাটান

বিল বাটান এর ইংরেজি নাম মার্শ স্যান্ডপাইপার (Marsh Sandpiper); বৈজ্ঞানিক নাম *Tringa stagnatilis* (Bechstein)। বদ্ধ জলার (Marsh) পাখি এই বাটান (চিত্র ২)। লম্বায় এরা ২৫ সে.মি., ডানা ১৩.৫ সে.মি., ঠোঁট ৪ সে.মি., পা ৫ সে.মি., লেজ ৫.৫ সে.মি., ওজন ৪০ গ্রাম। এদের প্রজননকালীন চেহারা বছরের অন্যসময়ের চেয়ে ভিন্ন। প্রজননকালীন সময় ব্যতীত এদের পৃষ্ঠদেশের রঙ হাল্কা ধূসর, তলদেশের রঙ সাদা, পিঠের ধূসর রঙ ঘাড়ের কাছে গাঢ় হয়েছে, কোমর সাদা, লেজে সরু হালকা খয়েরি টানা দাগ রয়েছে। চোখের উপর সাদা ভ্রুলেখা রয়েছে; চোখের মণির রঙ পাটকিলে। ঠোঁট লম্বা সূঁচের মত, গাঢ় শিঙে খয়েরি (horny-brown) বা কালচে রঙের; পা ও পায়ের পাতা জলপাই সবুজ। প্রজননকালীন পাখিদের পিঠে কালো ও মেটে রঙের ছোপ দেখা দেয়। মাথা ও গলায় কালো রঙের ছোট ছোট লম্বা দাগ হয়; দেহের পাশের সাদা অংশের উপর কালচে রঙ দেখা যায়, যা অনেকটা 'তীর' আকৃতির। স্ত্রী-পুরুষ পাখি দেখতে একই রকম। অপ্রাপ্ত বয়স্করা অপ্রজননকালীন প্রাপ্তবয়স্কদের মত দেখতে, শুধু ডানার উপর ও চোখের নিচের রঙ পাটকিলে হয়। ডানার পালকের ধারগুলিতে মেটে রঙের সরু ঝালরের মত দাগ থাকে।

নদী, নদীর মোহনা, কাদাভূমি, হাওড়, প্লাবিত ধানক্ষেত ও উপকূলীয় এলাকায় বিল বাটানের বিচরণ। কখনো একাকী, কখনো জোড়ে, আবার কখনো অন্যান্য জলচর পাখিদের সাথে যূথীবদ্ধভাবে এদের দেখা যায়। রাজশাহী শহর সংলগ্ন পদ্মাচরে এদের ছোট-বড় ঝাঁক দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ খাবারের খোঁজে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসে। অগভীর জলাশয়ে পানির উপর থেকে অথবা কাদার ভিতর থেকে লম্বা ঠোঁট ও মাথা ঢুকিয়ে খাবার খুঁজে খায়। ছোট কবচী প্রাণী, শামুক-ঝিনুক, কীট-পোকা ও ছোট মাছ খায় এরা। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে 'চী...উইপ্, চী...উইই...।' উড়ন্ত অবস্থায় ডাকে 'কী...উ, কী...উ'। বিল বাটানের প্রজনন ক্ষেত্র দক্ষিণ সাইবেরিয়ার স্টেপস্ অঞ্চলে। এপ্রিল-আগস্ট এদের প্রজননকাল। এসময় এরা ঘনঘন ডাক ছাড়ে 'টিউ-ই...উ, টিউ-ই...উ'। অন্যান্য বাটান, পানচিল এ জাতীয় জলচর পাখিদের সাথে একসাথে কলোনী বাসা করে বিল বাটান। স্বাদু পানি বা স্বল্প লবণাক্ত পানির উপরে ভাসমান জলজ উদ্ভিদের মধ্যে এরা বাসা করে। ঘাস দিয়ে নরম গদী বানিয়ে সেখানে ৩-৫টি ডিম পাড়ে। বাংলাদেশের শীতের পরিযায়ী এই পাখিটি ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় পরিযায়ন করে। এদের সংখ্যা বেশ ভালই আছে, হারিয়ে যাবার ভয় তেমন নেই। তবে বাংলাদেশে এদের সংখ্যা কিন্তু অনেক কমে গেছে, বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ জলাশয় আবাসে। নদী-নালা, বিল শুকিয়ে যাওয়ায় ও খাদ্য সংকটের কারণে এমনটি হয়েছে।

চিত্র ২. বিল বাটান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে তোলা ছবি)।

ঝোপের ছোট্ট পাখি প্রিনা

মতিহার চত্বর, তথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রকৃতির মায়ায় ভরা। নানা ধরনের গাছ-লতা-ফুলে ভরা ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে যে দু'টি প্রাণী, তার একটি হচ্ছে রঙ-বেরঙের প্রজাপ্রতি, অন্যটি ছোট-বড় নানা প্রজাতির পাখি। ক্যাম্পাসের ঝোপঝাড়ে বাস করে প্রচুর ছোট পাখি, এদের মধ্যে 'প্রিনা' অন্যতম। তবে অনেকেই চেনেনা প্রিনাদের, নামই শোনেননি বহুজন, আর চোখ মেলে এদের খুঁজেনই বা কয়জন?

দন্ডচারী (Passeriformes) বর্গের একটি গোত্র সিস্টিকোলিডি (Cisticolidae), যার বাংলা নাম 'তৃণকূজিনী'। এই গোত্রে ১৭টি গণে ১২০ প্রজাতির পাখি আছে, যার অধিকাংশই ছোট আকারের। বাংলাদেশে তৃণকূজিনী গোত্রের দু'টি গণের ৯টি প্রজাতির পাখি আছে। প্রিনাদের গণ নাম *Prinia*, যার বাংলা নাম 'দশবর্হ'। বেশ ছিমছাম গঠনের ছোট পাখি প্রিনা। মাঝারি থেকে লম্বা ঠোঁট এদের। ঠোঁট বেশ সরু ও অগ্রভাগ সূঁচালো। ঠোঁটের উপর হাল্কা গোঁফের রেখা আছে। পৃথিবীতে ২৪ প্রজাতির প্রিনা আছে, বাংলাদেশে আছে সাত প্রজাতির, আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আছে তিনটি প্রজাতি। প্রজাতি তিনটির বাংলা নাম মেটেবুক প্রিনা, নিরল প্রিনা ও কালচে প্রিনা। প্রিনা অনেক জায়গায় 'ফুটকি' নামেও পরিচিত।

মেটেবুক প্রিনা: এর ইংরেজি নাম Hodgson's Prinia ও Grey-breasted Prinia; বৈজ্ঞানিক নাম *Prinia hodgsonii* Blyth। এরা লম্বায় ১১ সে.মি., এদের ডানা ৪.৫ সে.মি., ঠোঁট ১.৩ সে.মি., পা ২.২ সে.মি., লেজ ৫ সে.মি., ওজন ৬ গ্রাম। মেটেবুক প্রিনাদের প্রজননকালে রঙ কিছুটা বদলায়। সাধারণত এদের পৃষ্ঠদেশ জলপাই-পাটকিলে, মরিচা লাল আভা আছে ডানার উপরে, পিঠের পিছনের অংশে ও কোমরে। তলদেশ সাদা, তবে বুকের দু'পাশ ধূসরাভ, পেট ও কোমরের নিচের দু'পাশের অংশ মেটে রঙের। ধূসর লেজের পালকগুলি ধাপে ধাপে সাজানো, লেজের শেষ প্রান্ত সাদা। চোখের উপর চিকন সাদা ভ্রুলেখা আছে ও চোখের পিছনটা কালচে। প্রজননকালে এদের পৃষ্ঠদেশ পাটকিলে-ধূসর অথবা স্লেট-ধূসর রঙের হয়ে উঠে। এসময় ডানার রঙ হয় পাটকিলে-বাদামি, ভ্রুলেখা থাকে না, তলদেশ পুরোটাই সাদা ও বুকে ধূসর-রঙা বন্ধনী থাকে। স্ত্রী-পুরুষ পাখি দেখতে একই রকম। এদের চোখের কণিকা পাটকিলে-কমলা, ঠোঁট কালো, হলদে-পাটকিলে পা ও পায়ের আঙুল; নখর শিঙে রঙের। অপ্রাপ্তবয়স্কদের তলদেশ সাদার উপর হলুদ রঙের ছোঁয়া; ডানা ও লেজের আগা মরিচা রঙের।

কৃষিক্ষেতের পাশের ঝোপঝাড়, বনভূমির ভিতরে গজানো ছোট গাছপালায়, লম্বা ঘাসভূমি, বাঁশঝাড় ও প্যারাবনের খোলা অংশের ছোট গাছ প্রিনাদের বাসভূমি। সাধারণত ছোট দলে এরা ঘুরে বেড়ায়। দল বেঁধে ঘন ঝোপের তলায় মাটিতে খাবার খুঁজে খায়। দলের একজন খাবার খুঁজে পেলে সেটি লেজ নাড়ায়, তখন অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। নানা ধরনের পোকা, শুককীট ও ফুলের মধু এদের খাদ্য। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মেটেবুক প্রিনাদের প্রজননকাল। জোড় বাঁধার আগে পূর্বরাগের অংশ হিসেবে মিহি সুরে গান গায়, 'হি-জি-জি, টিউ...টিউ...টিউ, টুইর...টুইর...টুইর, চিটি-ইউসি...ইউসি...ইউসি... হুইচ্...হুইচ...হুইচ'। ঝোপের মধ্যে মাটির কাছাকাছি পাতার মাঝে বাসা করে মেটেবুক প্রিনা। পাতাকে ঘাস ও নানা ধরনের আঁশ দিয়ে মুড়ে চোঙ আকৃতির বাসা বানায়। স্ত্রী প্রিনা ৩-৪টি সাদা বা হাল্কা নীল ডিম পাড়ে। ডিমের গায়ে লাল ও লালচে-পাটকিলে ফুটকি আছে। ডিম ফুটতে সময় লাগে ১১-১২ দিন। বাসা তৈরি করা, ডিমে তা দেয়া ও ছানাদের লালন-পালনে স্ত্রী-পুরুষ উভয় পাখি দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশের স্থানীয় আবাসিক পাখি এটি। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, মায়ানমার, দক্ষিণ চীন, থাইল্যান্ড ও লাওসে মেটেবুক প্রিনাদের বিস্তৃতি। বাংলাদেশে অন্য প্রিনাদের চাইতে এই প্রজাতির প্রিনার সংখ্যা কিছুটা কম, তাই এই প্রিনা ধরা বা মারা বাংলাদেশে আইনত দণ্ডনীয়।

নিরল প্রিনা (চিত্র ৩): একে সাধারণ প্রিনা নামেও ডাকা হয়। এর ইংরেজি নাম Plain Prinia; বৈজ্ঞানিক নাম *Prinia inornata* Sykes। দৈর্ঘ্যে ১৩ সে.মি., ডানা ৫ সে.মি., ঠোঁট ১.৪ সে.মি., পা ২ সে.মি., লেজ ৭ সে.মি., তবে গ্রীষ্মে লেজের বড় পালক পড়ে যায়, তখন লেজ ৫.২ সে.মি., ওজন ৭ গ্রাম। পাটকিলে-বালি রঙা পাখি এরা; স্ত্রী-পুরুষ পাখির রঙ একই রকম। পাখিটিকে সহজে চেনা যায় খাঁজকাটা লেজ ও দুই রঙা ঠোঁটের জন্য। আবার গ্রীষ্মে এর উপরের ঠোঁট কালো ও নিচের ঠোঁট হলুদ হয়; শীতে উপরের ঠোঁট পাটকিলে-বাদামি ও নিচের ঠোঁট হলুদ হয়; শীতে উপরের ঠোঁট পাটকিলে-বাদামি ও নিচের ঠোঁট কমলা-পাটকিলে হয়। পাখিটির পৃষ্ঠদেশের রঙ বালির সাথে মরিচা-পাটকিলে রঙ মিশালে যেমন হয় তেমন, তবে প্রজননকালে রঙটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এর তলদেশ গাঢ় মেটে রঙের। লেজের পালকের ধারগুলিতে ও শেষপ্রান্তে যথাক্রমে কালচে ও সাদা দাগ দেখা যায়। ডানার পালকের কিনারায় মরিচা রঙ আছে। পায়ের উপরিভাগে গাঢ় মেটে রঙের আভা দেখা যায়। লম্বা, মাখন-রঙা ভ্রুলেখা ও ঠোঁটের দিকের অংশটা। পা পুরোটা হলদে-লালচে, নখর শিঙে রঙা। অপ্রাপ্তবয়স্কদের গায়ের রঙে ঘন লালচে আভা দেখা যায়।

ঘন ঝোপ, লম্বা ঝোপ, ধানক্ষেতের ধার, বন ও প্যারাবনের নিচু গাছপালার ভিতর নিরল প্রিনা জোড়ায় বা ছোট দলে বাস করে। ঘাসের ভিতর, গাছের পাতা ও ছোট ছোট ডালের ভিতর দিয়ে উড়ে উড়ে পোকা খায়। ঘাসফড়িং, গোবরে পোকা, পিঁপড়া, শুককীট, মাকড়সা ও ফুলের মধু এদের খাদ্য। খাবার খোঁজার সময় সারাক্ষণ লেজটাকে উপরে নিচে বা দু'পাশে নাড়াতে থাকে। বিপদ দেখলে এরা সতর্ক সংকেত পাঠায় 'পিট্...পিট্..পিট্'। মার্চ-অক্টোবর পর্যন্ত প্রজননকাল। ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের শুরুতে জোড় বাঁধতে শুরু করে। প্রিনার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় পুরুষ পাখি গান গায় টানা সুরে, 'টিই...টিই...টিই, ট্রিক...ট্রিক...ট্রিক, কিঙ্ক...কিঙ্ক..., চি...উ...'। বারবার এভাবে বহুক্ষণ ধরে গায়। নিচু ঝোপের ভিতর বা ঘাসের চাপড়ার ভিতরে অগোছালো বলের মত বাসা বানায়। ঘাস-পাতাকে মাকড়সার জাল দিয়ে জড়িয়ে বাসাটা তৈরি করে। স্ত্রী নিরল প্রিনা ৩-৫টি ধূসরাভ-সবুজ ডিম পাড়ে। ডিমের আকার ১.৫×১.১ সে.মি.। বাচ্চা ফুটতে সময় লাগে ১২ দিনের মত। ঘরকন্নার সমস্ত কাজে দম্পতি পালা করে কাজ করে। বাংলাদেশের স্থানীয় আবাসিক পাখি নিরল প্রিনা। এশিয়ার দক্ষিণ, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলিতে এর বিস্তৃতি রয়েছে। এছাড়াও লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় নিরল প্রিনা বাস করে। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশগুলিতে নিরল প্রিনার সংখ্যা বেশ ভালই আছে।

কালচে প্রিনাঃ এর ইংরেজি নাম Ashy Prinia; বৈজ্ঞানিক নাম *Prinia socialis* Sykes। পৃষ্ঠদেশে স্লেট-ধূসর রঙের প্রাধান্যের কারণে কালচে প্রিনা বা অ্যাশি প্রিনিয়া নাম হয়েছে। বাংলাদেশে এর দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ও সিলেটে এদের দেখা পাওয়া গেলেও ঢাকা ও রাজশাহী থেকে ১৯৭০-এর পর এদের দেখা পাওয়ার কোন রেকর্ড নেই। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবছর না দেখলেও ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে অন্ততঃ দু'বছর কালচে প্রিনাকে দেখা গেছে। দৈর্ঘ্যে ১৩ সে.মি., ডানা ৪.৭ সে.মি., ঠোঁট ১.৪ সে.মি., পা ২ সে.মি., লেজ ৭ সে.মি., ওজন ৭ গ্রাম। এর পৃষ্ঠদেশের রঙ মরিচা-পাটকিলের উপর স্লেট-ধূসর মাখানো; তলদেশের রঙ কমলা-মেটে। খুব সুন্দর রঙের বাহার পাখিটির। মাথার চাঁদি, কানের উপর ও পিঠে স্লেট-ধূসর রঙটা তুলনামূলকভাবে ঘন। ডানা ও লেজের পালকগুলি ঘন মরিচা-পাটকিলে রঙের। ডানার পাশের দিকে কালো আভা; লেজের প্রান্তদেশগুলির রঙটা ফ্যাকাশে। প্রজননকাল ব্যতিরেকে ছোট সাদা ভ্রুলেখা দেখা যায় ঠোঁট ও চোখের মাঝে। এদের কণিকা ও চোখের বলয় গাঢ় কমলা-পাটকিলে রঙের; পা ও পায়ের পাতা খয়েরি-হলুদ অথবা খয়েরি-মাংসল রঙের। ঠোঁট গ্রীষ্মকালে কালো, শীতকালে হাল্কা খয়েরি হয়ে থাকে। মুখের ভিতরটা গ্রীষ্মকালে কালো ও শীতকালে কালচে-পাটকিলে বা স্লেট-গোলাপী রঙের হয়। স্ত্রী-পুরুষ পাখি দেখতে একই রকম। তবে কিশোর পাখিদের পিঠের দিকটা জলপাই-পাটকিলে, তলদেশ জলপাই-পাটকিলের উপর হলুদের ছোঁয়া থাকে; আর লেজটা খাটো হয়।

পাহাড়-টিলার পাদদেশে বা সমতলভূমিতে অগভীর জলাশয়ের কিনারায় জন্মানো ঘাস ও ছোট ঝোপঝাড়ে কালচে প্রিনার বাস। এদেরকে সাধারণত একাকী বা জোড়ে বিচরণ করতে দেখা যায়। অত্যন্ত চঞ্চল পাখি এরা; ঘাসের কাণ্ডে ও ঝোপের ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে খাদ্য খুঁজে বেড়ায়। অন্যান্য প্রিনাদের মত ঘন ঘন লেজ নাচায়। উড়বার সময় মাঝে মাঝেই 'কিট্..কিট্..কিট্' শব্দে ডাকে।

কালচে প্রিনা বাসা বাঁধে মার্চ-নভেম্বর পর্যন্ত। পূর্বরাগের অধ্যায়ে পুরুষ পাখি তীক্ষ্ণ নাকিসুরে গান গায় 'নাইয়ির...নাইয়ির...নাইয়ির, জিম্মি...জিম্মি...জিম্মি, ট্রিক-ইট্‌চিট্...ইট্‌চিট্...ইট্‌চিট্'। ছোট নদী তীরে জন্মানো ঝোপঝাড়ে বাসা বাঁধে। ঘাসের কাণ্ড অথবা চিরল পাতাকে লম্বালম্বিভাবে সেলাই করে বাসা তৈরি করে। স্ত্রী প্রিনা ৩-৫টি লালচে-পাটকিলে রঙের ডিম পাড়ে। ডিমের আকার ১.৬×১.২ সে.মি.। এদের ডিমও ফুটতে ১২ দিন সময় নেয়। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি পালা করে পরিবারের সব কাজ করে। বাংলাদেশ ছাড়াও কালচে প্রিনা বাস করে পাকিস্তান, ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকায়। যদিও অন্যান্য দেশগুলিতে কালচে প্রিনার সংখ্যা বেশ ভালই, তবে বাংলাদেশে পাখিটি বন্য আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
মেটেবুক ও নিরল প্রিনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভালই আছে। তবে দু'দন্ড দাঁড়িয়ে আমাদের দেখবার সময় নাই। আর হঠাৎ চোখে পড়লেও অনেকে মনে করেন চড়ুঁইদের ছুটোছুটি চলছে। এদের দেখতে পেলে একটু দাঁড়িয়ে দেখুন; প্রকৃতি কত না সম্ভারে ভরে রেখেছে আমাদের চারপাশ।

চিত্র ৩. নিরল প্রিনা (পদ্মা নদীর চর থেকে তোলা ছবি)।

তথ্যসূত্রঃ

Ali, S. 2002. *The Book of Indian Birds* (13th edn.). Bombay Natural History Society, Oxford University Press, Oxford, UK.

Halder, R. R. 2010. *A Photographic Guide to Birds of Bangladesh*. Baikal Teal Publication.

সেলিনা পারভীন ও আমিনুজ্জামান মো. সালেহ রেজা ২০১৫। *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাখি বৈচিত্র্য*। সাজ প্রকাশন, ডেমরা, ঢাকা।

আশ্চর্য প্রাণী টিউবওয়ার্ম

তৌকির মাহমুদ আসিফ
তৃতীয় বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৪০৬৬৭১৬

১৯৯২ সালের কথা। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মনিকা ব্রাইট গভীর সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে চান। সেজন্য ঐ বছরই তিনি গভীর সমুদ্রে ডাইভ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি এলভিন নামক একটি সাবমারসিবলে করে গভীর সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে এক ধরনের আশ্চর্য কীটপ্রাণী দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। পরে এটি নিয়ে আরও গবেষণা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। সেই প্রাণীটির চোখ, মুখ, পেট কিছুই নেই। এটি বেঁচে থাকে এর ভিতরে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়ার মিথোজীবীতা (symbiosis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অমেরুদন্ডী এই প্রাণীটির নাম হচ্ছে টিউবওয়ার্ম (tube worm), যার বৈজ্ঞানিক নাম *Riftia pachyptila* । এটি Annelida পর্বের প্রাণী।

টিউবওয়ার্মটি ব্যাকটিরিয়াকে নিজের দেহে থাকতে দেয় এবং এর বদলে ব্যাকটিরিয়া টিউবওয়ার্মের জন্য খাবার তৈরি করে দেয়। যে প্রক্রিয়ায় ব্যাকটিরিয়া খাবার তৈরি করে তাকে রাসায়নিক সংশ্লেষণ (chemosynthesis) বলা হয়। টিউবওয়ার্মের বিষাক্ত উপাদানকে রূপান্তরিত করে খাদ্য তৈরি করা হয়। সর্বপ্রথম এই টিউবওয়ার্ম পাওয়া যায় গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে। ফ্রান্স ও আমেরিকা একটা যৌথ অভিযান চালিয়েছিল সেখানে। সেখানে গভীর সমুদ্রে তারা একটি হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট (hydrothermal vent) আবিষ্কার করেন। এটি এক ধরনের খোলা গর্তের মতো। যেখান থেকে গরম খনিজসমৃদ্ধ তরল বের হয়ে আসে। এখান থেকেই প্রথম *Riftia pachyptila* এর সন্ধান পাওয়া যায়।

ড. ব্রাইটের অভিযানের পরে একটা প্রশ্নের জন্ম নেয়, এতো বেশি সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া টিউবওয়ার্মগুলোর ভেতরে প্রবেশ করে কীভাবে? ২০০৮ সাল পর্যন্ত এর কোনো উত্তর জানা ছিল না। ড. ব্রাইট এবং তার সহকর্মীরা ২০০৮ সালে বিখ্যাত জার্নাল *Nature*-এ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যেখানে কখন, কীভাবে এবং কেন ব্যাকটিরিয়াগুলো টিউবওয়ার্মের ভেতর নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে এবং মিথোজীবী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে নিজেরা বেঁচে থাকে, এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

২০০৪ সালে তারা কিছু অপ্রাপ্তবয়স্ক টিউবওয়ার্ম নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করেন। এরপর এগুলোকে Vestimentiferan Artificial Settlement Device (VASDs) করে প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দীর্ঘ ৪ বছর গবেষণা করার পর তারা বুঝতে পারেন যে, টিউবওয়ার্মের ত্বক সংক্রমণের মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়াগুলো এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এরা ওয়ার্মের টিস্যুর ভেতরে চলে যায়। সেখানে ব্যাকটিরিয়াগুলো নিজেদের জন্য ট্রপোসোম (troposome) বানিয়ে তারপর তারা সেখানে থাকা শুরু করে। ট্রপোসোম হচ্ছে এক ধরনের অঙ্গ, যেটা পোষকরূপে ব্যাকটিরিয়াকে ধারণ করে। এখান থেকেই সিমবায়োসিস প্রক্রিয়া শুরু হয়। ট্রপোসোম কিন্তু একটা উন্নতমানের অঙ্গ। এর ভেতরকার কোষীয় গঠন উন্নতমানের এবং এটি অনেকগুলো লোবযুক্ত। বেশিরভাগ ট্রপোসোমের ভেতর ব্যাকটিরিওসাইট থাকে, যেগুলো একটা কোষীয় চক্র মেনে চলে। এ থেকে বোঝা যায়, টিউবওয়ার্মের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য বেশ আশ্চর্য রকমের।

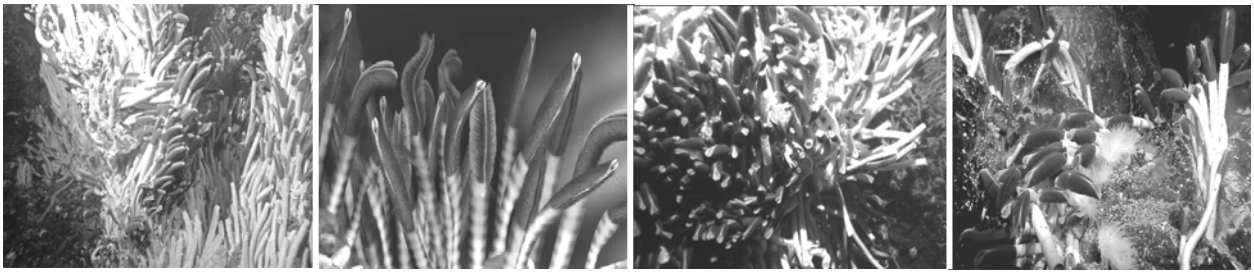

চিত্র: টিউবওয়ার্ম (*Riftia pachyptila*)

তথ্যসূত্র:

মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'জিরো টু ইনফিনিটি'। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০১৭। লালমাটিয়া, ঢাকা।
www.google.com

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় : হাওড় অঞ্চলের বন্যা

মো. আলমগীর
৩য় বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৫১০৯৫৯১১০

বাংলাদেশের একটি সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলো হাওড় অঞ্চলের বন্যা। বিষয়টি সংক্ষেপে নিচে আলোচিত হলো।

হাওড় অঞ্চলের বন্যা

কোন কোন বছর অতিবৃষ্টি আর সীমান্তের ওপারে পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে গেছে বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চল। সুনামগঞ্জসহ সেখানকার ছয় জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বার বার। পানিতে তলিয়ে যায় ধান, আর পানি দূষিত হওয়ায় মরে মাছ ও হাঁস। গো-খাদ্যের অভাবে গবাদি পশুও মারা যায়। পুরো এলাকায় মানুষের জন্য কাজের কোন সুযোগ থাকেনা, তাই দেখা দেয় খাদ্য সংকট। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বন্যা কবলিত হাওড় এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা অন্তত সাড়ে ৮ লাখ। ফসল নষ্ট হয় ২ লাখ হেক্টরের বেশী জমির। ক্ষতিগ্রস্থ হয় ১৮ হাজার ঘরবাড়ি। আর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ২০১৭ সালের বন্যায় ক্ষতি হওয়া মাছের পরিমান ২১৩ মেট্রিক টন। হাওড়ে মাছের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আগাম বৃষ্টির কারণে অপরিপক্ক ধান বা দুধ ধান পানিতে তলিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে পঁচে যায়। অপরিপক্ক ধানের কার্বোহাইড্রেট পঁচনের জন্য পানিতে বায়োলোজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে যায়। এতে করে হাওড়ের পানিতে অক্সিজেনের পরিমান কমে যায় এবং মাছের মৃত্যু ঘটে।

চিত্র: হাওড় অঞ্চলের সাম্প্রতিক বন্যা (২০১৭)।

আরেক বিশ্লেষণে জানা যায়, যে সমস্ত হাওড়ে জলাভূমির মোট আয়তনের তুলনায় ধান চাষের জমির আয়তন কম এবং হাওড়ের গভীরতা বেশী, সেখানে মাছের মৃত্যু তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। অন্যদিকে, যে সব হাওড়ের মোট আয়তনের তুলনায় ধান চাষের জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং হাওড়ের গভীরতা কম, সেখানে মাছের মৃত্যু হয়েছে বেশি।

মাছের মৃত্যুর পাশাপাশি হাঁসের মৃত্যুর কারণও অনুসন্ধান করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে হাওড়ের বোরো ধানক্ষেতে প্রচুর পোকামাকড় জন্মায়। এগুলোর মাঝে অনেক বিষাক্ত পোকামাকড়ও থাকে। হাওড়ের আকস্মিক বন্যায় পোকা-মাকড়গুলো ভেসে হাওড়ের পাড়ের কাছাকাছি চলে আসে; এতে করে হাঁস সহজে এগুলো খেতে পারে। স্থানীয় জনসাধারণের মতে, এ সমস্ত বিষাক্ত পোকামাকড় খাওয়ার কারণে হাঁসের মৃত্যু হয়। হাওড়বাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার সর্বশেষ ক্ষতি হয় বন্যায়।

পরিস্থিতি উত্তরণের পথ

মৎস্য সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য সংক্রান্ত এই বহুমুখী ও জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞ টিম সুপারিশমালা প্রদান করেন- যেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. হাওড়বাসীর আগামী একবছর খাবারের সংস্থান, সহজ শর্তে ঋণ দান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের।
২. আগামী তিন মাস হাওড়ে মাছ আহরণের চাপ কমানোর, হাওড় অঞ্চলে খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ, খাঁচায় মাছ চাষ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এজন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, হাওড়ে মাছ আহরণের চাপ কমানোর জন্য সমাজভিত্তিক খাঁচায় মাছ চাষ লিজের আওতায় থাকা হাওড়ের বিলগুলো শুকিয়ে মাছ না ধরা।
৩. কিছু গভীর হাওড়কে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা।
৪. অন্য উৎস থেকে গুণগতমানের মাছের রেণু সংগ্রহ করে হাওড়ে অবমুক্ত করা।
৫. অন্তত ৬ মাস মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট ও মৎস্য দপ্তরকে হাওড়ের মৎস্য সম্পদের সার্বিক অবস্থা নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা।
৬. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ইন্টারডিসিপ্লিনারি বিশেষজ্ঞ আছেন সেখান থেকে মৎস্য বিজ্ঞান পশুপালন বিজ্ঞান, ফসল উৎপাদন বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত দীর্ঘ মেয়াদি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করেন তারা।

জুওলজিরই যন্ত্রণায়!!

মোঃ মোখলেসুর রহমান (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)

জানটা গেল পড়তে এসে
জুওলজিরই যন্ত্রণায়
কাটলে কেঁচো কাদাই দেখি
হয়তো ওদের অস্ত্র নাই।
স্পিসিস আর জেনাস নিয়ে
জ্যাম বেঁধে যায় জিনিসটার
হয়েছে কেবা এসব জেনে
এ জামানায় মিনিস্টার।
বৈজ্ঞানিকী নামটা শুনে
পিন্ডিটা যায় চটকে
বিজ্ঞানীরা কি যে ডাকেন
রাম ছাগল আর গোটকে।
বৈজ্ঞানিকী নামের বানান
শান্তি কিংবা স্বস্তিনাশক
পড়ার চাপে হাড় পানি হয়
পুরোপুরি অস্থিনাশক।
রিস্কী নামের রেশম পোকা
বোম লাগানো মোরি নাম
বোমের পরেও বিক্সও আছে
ভয়তে জপি হরিনাম।
ইউরো ধাঁচের এক কর্ডাটার
নাম যেন কি লার্ভার
হয়তো হবে ট্যাডপোল
যাই যে ভুলে বারবার।
কটর মটর প্রাণিভূগোল
ফ্যাঁকড়া বড় কর্কটের
শুকনো শীতে কইলে ওটা
চামড়া ফেটে যায় ঠোঁটের।
নেই ফোবিয়া অ্যাম্ফিবিয়ায়
বাট বিলুপ্ত বর্গ
ল্যাবিরিন্থোডোনসিয়া
শুনতে লাগে ডর গো।
কষ্টে মিলে ক্রাস্টেশিয়া
পাইনা খুঁজে বেনথোস
ঘাড় কুঁজো হয় খুঁজতে গিয়ে
খাটনি করি যতই রোজ।
সেল ডিভিশন ভীষণ কঠিন
পড়তে গেলে হায়রে
তালকানা হই কূল হারিয়ে
কিনার নাহি পাই রে।
ফ্যাঁকড়া আছে মেটাজেনেসিসে
জিনিস বড় জবরই
জানা শোনার নেই তো ধারে
নেইনি কোন খবরই।
হয়না জানা জনুক্রম
হচ্ছি গলদঘর্ম
ঘুরছি কলুর বলদ হয়ে
নয়তো সহজ কর্ম।
দ্রবীভূত অক্সিজেনও
ভূতের মতো যায় ঢুকে
জল ছেড়ে তা ফুলকাতে যায়
তাতেই ল্যাঠা যায় চুকে।
আরশোলাতে গ্ল্যান্ড আছে
নামটা সেলিভারি গো
ব্যবচ্ছেদের শ্রাদ্ধটা
আগলি ভেরি তারি গো।
হান্ডিগুলো পড়তে গিয়ে
রেডিও দেখি আলনায়
আবোল তাবোল আজব কথা
ছন্দ ছিরি তাল নাই।
জীবাশ্মতে মুখ গোসা হয়
পড়তে গেলে ঘাম আসে
হাঁপিয়ে উঠি হিপ্পাসেতে
ক্যাটকেটে সব নাম আসে।
হোমো হিডেলবার্জেনসিস
শুনলে মাথায় বাজ পড়ে
কাসুন্দিটা খুব পুরোনো
কেউ কি এসব আজ পড়ে?
বিপদ মানে মহা বিপদ
ঐ যে মহাধমনী
পোড়া কপাল! যতই পড়ি
যাই যে ভুলে অমনি।
গিট্টু বানান টেরিগোটায়
গিট্টু আছে টেরিতে
দূর হয়েছে টেরির ত্যাড়া
কিন্তু অনেক দেরিতে।
অস্ত্র ছিঁড়ে আনতে রিবন
ধাপ রয়েছে কতনা
পদ্মা সেতু নির্মাণেরও
ঝক্কি বুঝি অতনা।
মোম টিস্যুরই অন্তরেতে
অনুরাগের ফাগ বেড়ে যায়
মোম সরেনা টিস্যু থেকে
মনে ভীষণ রাগ বেড়ে যায়।
মোম টিস্যুরই মহান প্রেম
ওদের মাঝে চিড় ধরাতে
শির উঁচিয়ে এগিয়ে আসে
নেই যে এমন বীর ধরাতে।
মোম হয়েছে মমতাজও
বাদশাহ্ টিস্যুর হৃদ-মাঝারে
মরীচিকায় হয়নি মলিন
প্রেমটা পুরো তরতাজারে।
ঘাড় কুঁজো হয় জাইলিনের
মোম সরাতে সোজা ঘাড়ও
মোম প্রবলেম সমস্যাটা
গাঢ় থেকে হয় যে গাঢ়।

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর

মো. ফিরোজ সরকার
১ম বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৭১০৩৫৯১০৫

আমরা কেউ না, ছোট এক প্রাণী, প্রকৃতিতে মিশে থাকি
আমরা যে আছি, টের পাও যেই ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকি।

ছোট বেলাটায় জলে থাকলেও, বড় বেলায় থাকি স্থলে
জীববিদ্যায় তাই আমাদের উভচর প্রাণী বলে।
বড় বেলা নেই, ছোট বেলাটাতে আমাদের লেজ থাকে
লেজ কেন খসে? -জানিনা তো বাপু! জিজ্ঞেস করি কাকে?

সাঁতরাতে পারি, লাফ দিতে পারি, যেতে পারি চুপি হেঁটে
বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি ছাড়াই জীবনটা যায় কেটে।
ছোট বেলা নিই ফুলকোতে শ্বাস, বড় বেলা ফুসফুসে
আমরা ব্যাঙেরা মনের ভেতরে দুঃখ রেখেছি পুষে।

আমাদের মাঝে তারকা হচ্ছে এক 'কুনো', এক 'কোলা'
বাড়াবাড়ি দেখে বাকি ব্যাঙদের অভিমানে গাল ফোলা।
বাকিদের নাম কয়জনে জানে? তাঁদের কি ভাবো কেঁচো?
যেমন রয়েছে 'লাল-পা গেছো', আরও আছে 'ডোরা গেছো'।

'কটকটি' 'চীনা' 'কোপের আসাম', আছে 'বড় লাউবিচি'
'সবুজ' ব্যাঙেরও নাম ভুলে যাও? তোমরা এমন! ছিঃ ছিঃ!
'কুনো', 'কোলা' ছাড়া তোমাদের কাছে পেলনা কেউ তো দামও
এই কারণেই বিষণ্ন থাকে 'লাল-চোখা', 'ঝিঁ-ঝিঁ', 'ভামো'।

আমাদের, মানে ব্যাঙদের কথা রাখতে চাও না মনে
চুপচাপ থাকি ডোবার ভেতরে অথবা দূরের কোন বনে।
বৃষ্টি হওয়ার সংকেত দিতে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকি
ক্ষতিকর সব পোকাদের খেয়ে ফসল বাঁচিয়ে রাখি।

অবহেলা কর? ব্যাঙেরা কিন্তু তোমাদের ভালোবাসে
তারপরও কিনা আমাদের কাটো জুওলজি স্যারের ক্লাসে।

বন্যা নয়, জিতবে এবার মানবতা

মো. আব্দুল মোমিন প্রামাণিক
চতুর্থ বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৪০৭৬৬৬৬

ইংরেজী ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এই বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকগণের পরামর্শ এবং বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর ড. সেলিনা পারভীন ম্যাডামের অনুমতিক্রমে শিক্ষার্থীবৃন্দ পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করে।

ত্রাণ সংগ্রহ ঃ প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি একাডেমিক ভবন ও আবাসিক হল, বিনোদপুর বাজার, সাহেব বাজার, কাজলা, কাঁটাখালি বাজার, বানেশ্বর বাজার এবং আরো বেশ কিছু এলাকা থেকে সর্বমোট ৫৩ হাজার টাকা সংগ্রহ করে।

ত্রাণ বিতরণ ঃ ত্রাণের অর্থ সংগ্রহের পর সকল শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণের স্থান হিসেবে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাকে নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি ও সকল শিক্ষকের অনুমতিক্রমে বিভাগের পক্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মো. আব্দুল মোমিন প্রামাণিক, মো. মহিদুল ইসলাম ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মো. শাখাওয়াত হোসেন ২৩শে আগস্ট দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলা অভিমুখে যাত্রা করে। ২৪শে আগস্ট সকাল ৮.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত ৪টি গ্রাম পরিদর্শনপূর্বক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে ২৫শে আগস্ট ছাত্র প্রতিনিধিত্রয় রাজশাহীতে ফেরত আসে।

চিত্রঃ বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রম।

পারমাণবিক বিপর্যয় ও মানুষের উপর এর প্রভাব

মো. রুহুল আমিন
তৃতীয় বর্ষ (সম্মান); রোল: ১৫১১০৫৯১২৩

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার যে সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজে এসেছে এমনটা নয়। বিজ্ঞান আমাদের হাতে এমনও কিছু তুলে দিয়েছে যা আমাদের নিজেদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় বলে, বিজ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ! আর তেমনই একটি আবিষ্কার হচ্ছে পারমাণবিক বোমা। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানের বহুল আলোচিত একটি বিষয় হল পারমাণবিক বিপর্যয় ।

পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে পরমাণু সম্পর্কে জানতে হবে কারণ এর মূল গঠন উপাদান হল পরমাণু। যীশুখৃষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন, যদি কোন বস্তুকে ক্রমাগত বিভক্ত করা হয়, এক পর্যায়ে তা আর খন্ডিত হয়না, সেটাই হল পরমাণু। পরবর্তীতে পরমাণুর ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন আবিষ্কৃত হয় ।

পারমাণবিক বোমা আবিস্কারের ইতিহাস: বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম হলেন স্যার আলবার্ট আইনস্টাইন। পারমানবিক বোমা আবিষ্কারে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মানুষের চিন্তার জগতে কয়েকটি বৈপ্লবিক ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন। তার মধ্যে ভর ও শক্তির বিনিময়তা হল অন্যতম। তার বিখ্যাত সমীকরণটি হল $E=mc^2$ অর্থাৎ পদার্থের ভরকে আলোর বেগের বর্গ দ্বারা গুণ করলে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটাই হল ঐ পরিমাণ পদার্থের আবদ্ধ শক্তি । এরপর ১৯৩৮ সালে জার্মানীর অটোহান এবং স্ট্র্যাসমান নামে দু'জন রসায়নবিদ ইউরেনিয়াম ২৩৫ মৌলের পরমাণু ভাঙতে সফল হন। তারা দেখলেন যে, ইউরেনিয়ামের অণু ভাঙ্গলে প্রচন্ড শক্তির সৃষ্টি হয় । এই শক্তিকে সামরিক কাজে ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি. রুজভেল্টের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪২ সালে ম্যানহাটান প্রজেক্ট শুরু করেন, যা কিনা বিশ্বের অন্যতম বড় বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক প্রজেক্ট ছিল। গবেষণার ফলাফল হিসেবে ১৯৪২ সালেরই ২ ডিসেম্বর এনরিকো ফার্মী (Enrico Fermi) এবং তাঁর সহকর্মীরা ইউরেনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম গঠনে সক্ষম হন এবং U-238 থেকে U-235 কে আলাদা করেন। প্রথম বোমার সফল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই মেক্সিকোর একটি মরুভূমিতে, যা ছিল ১৮,০০০ টন টিএনটি এর সমতুল্য শক্তির।

পারমাণবিক বোমার বাস্তব প্রয়োগ: বিশ্বের প্রথম যুদ্ধ ক্ষেত্রে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট তারিখে জাপানের হিরোশিমা শহরে বোমা নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে। যার ধ্বংস ক্ষমতা ছিল ১৩,০০০ শর্ট টন (১১,৮০০ মেট্রিক টন) টিএনটি। বোমাটির নিট ওজন ছিল ৯,০০০ পাউন্ড (৪,১০০ কেজি)। এর একটি সৌখিন নাম ছিল লিটল বয় (Little boy)। সকাল ৮.১৫ মিনিট হিরোশিমার উপর নেমে আসে এক মহাদূর্যোগ। জীবিকার সন্ধানে ছুটে চলা নিরাপরাধ লাখো মানুষের জীবন অবসান ঘটতে যাচ্ছে এই খবর কেউ জানত না। লিটল বয় মাটিতে পড়ার আগেই ভূমি থেকে ৫৮০ মিটার উঁচুতে বিস্ফোরিত হয়। তখন তার চারপাশের তাপমাত্রা মুহূর্তের মধ্যে হয়েছিল প্রায় ৭ মিলিয়ন ডিগ্রি সে.। সাথে সাথেই কেন্দ্রস্থলের ২ কিলোমিটারের মধ্যে তাপমাত্রা ছড়িয়ে পড়ে এবং ৫০০ মিটারের মধ্যে সব কিছু গলে যায়। মুহূর্তের মধ্যে শহরটি মৃত্যুকূপে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৭১ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় (এনসাইক্লোপেডিয়া)। এছাড়া, পরোক্ষ কারণে আরো লক্ষাধিক মানুষকে মরতে হয়েছে। বোমা নিক্ষেপকারী পাইলট টিবেটস বিমান থেকে শহরের ভয়াবহ ধ্বংসের দৃশ্য দেখে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, হায় ঈশ্বর ! এ কি করলাম। এরপরে দ্বিতীয় ধ্বংসলীলা চালানো হয় জাপানের আরেকটি শহর নাগাসাকিতে। যা ছিল জাপানের সমুদ্রবন্দর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। ১৯৪৫ সালের ৯ আগষ্ট বেলা ১১.২ মিনিট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমারু বিমান থেকে ফ্যাটম্যান (Fatman) নামের পারমানবিক বোমাটি এই শহরে নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে প্রায় ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন লোক মারা যান (এনসাইক্লোপেডিয়া)। এখনও সেখানে কোন সন্তান জন্ম নিলে তারা বিকলাঙ্গ এবং পঙ্গু অবস্থায় জীবন যাপন করে।

চেরনোবিল বিপর্যয়: চেরনোবিলের বিপর্যয় হল ইউক্রেনের (তৎকালীন ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র; যেটি ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ঘটা একটি পারমাণবিক দূর্ঘটনা। একে ধরে নেওয়া হয় স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহতম পারমাণবিক দূর্ঘটনা। ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ১ টা ২৩ মিনিটে ইউক্রেন বেলারুশ সীমান্তে অবস্থিত পরমাণু ক্রেন্দ্রটির চতুর্থ (বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট পারমাণবিক চুল্লীর সংখ্যা ৪টি) পারমাণবিক চুল্লী থেকেই দূর্ঘটনার সূত্রপাত হয়। দূর্ঘটনাটি মূলত ঘটেছিল নিরাপদ শীতলীকরণের উপর একটি পরীক্ষা চালানোর সময়। রাতের শিফ্‌টে দায়িত্বরত কর্মীরা ভুল করে পারমাণবিক চুল্লীটির টার্বাইনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শীতল পানি প্রবাহিত করে। ফলে সেখানে বাষ্প কম উৎপাদিত হয়। এতে করে পারমাণবিক চুল্লীটি উত্তপ্ত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে প্রচন্ড বিষ্ফোরণ ঘটে। পর পর প্রায় একই সঙ্গে ঘটা দুটি বিস্ফোরণে বিদ্যুৎ

কেন্দ্রের চতুর্থ পারমাণবিক চুল্লীর উপরের প্রায় এক হাজার টন ওজনের কংক্রীটের ঢাকনা সরে যায় এবং ছাদ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এক বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়। দূর্ঘটনার ২০ ঘণ্টা পর বাইরের বাতাস ঢুকে পারমাণবিক চুল্লীর দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে সেখানে বিরাট অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়। এ আগুন ১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এতে করে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় তৈরী পদার্থ পরিবেশে প্রায় ১ কিলোমিটার উঁচু অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রচুর পারমাণবিক ধূলো পরিবেশে দূষণ ছড়িয়েছিল। পরিবেশে পারমাণবিক পদার্থ বেরিয়ে পড়েছিল প্রায় ৫০০ টি যা ১৯৪৫ সালে হিরোশিমার উপর আমেরিকার ফেলা পারমাণবিক বোমার সমান। পারমাণবিকভাবে সক্রিয় মেঘ এই দূর্ঘটনার ফলে উদ্ভুত হয়ে ইউক্রেন, ব্রিটেন, এমনকি পূর্ব আমেরিকার উপরেও গিয়েছিল।

দূর্ঘটনার কারণ: দূর্ঘটনার জন্য কর্তব্যরত কর্মীদেরই দায়ী করা হয়। কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা বন্ধ করা ছিল এবং পারমাণবিক চুল্লীটি অনুপযুক্ত অবস্থায় চালানো হচ্ছিলো। যার ফলে শক্তি নির্গমন অতিরিক্ত বেড়ে যায়। আবার একটি গবেষণায় বলা হয়, কর্মীদের রাতের শিফটে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিক ব্যবস্থাপনাও দায়ী ছিল। এ কারণে ৩ জনকে ১০ বছরের শাস্তি দেওয়া হয়।

পরিণতি: ঘটনার সময় চেরনোবিলে প্রায় ১৪ হাজার বসতি ছিল। দূর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ৪ জন কর্মী মারা যান। পরবর্তীতে ২৩৭ জন মানুষ পারমাণবিক বিকিরণের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রথম তিন মাসে ৩১ জন মৃত্যুবরণ করে যাদের অধিকাংশই ছিল উদ্ধারকর্মী। সরকারি তথ্যমতে, দূর্ঘটনার কারণে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ছিল ৬ লক্ষ শিশু। বর্তমানে চেরনোবিল শহরটি পরিত্যক্ত এবং এর ৫ মাইল এলাকা জুড়ে কেউ বাস করে না। এরপর হাজার হাজার মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলো।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ: পারমাণবিক দুষণ থেকে পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে একটি বিশাল কংক্রীটের খোলসের মধ্যে দূর্ঘটনাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ৪র্থ পারমাণবিক চুল্লীটিকে ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলা হয়। ওই অস্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত পারমাণবিক কেন্দ্রটির ধ্বংসাবশেষকে আটকে রাখার জন্য নির্মিত একমাত্র স্থাপনা। চেরনোবিলের প্রায় ২০০ টন পরমাণু জ্বালানি থেকে যে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়েছে, তা হাজার বছরেও দূর হবে না। তাই পরমাণু জ্বালানি বাইরের পরিবেশের আওতামুক্ত রাখতে নতুন একটি নিরাপত্তা স্থাপনা নির্মাণ শুরু হয়েছে, যার নির্মাণ ব্যয় ১৬০ কোটি ইউরো বা ২২১ কোটি ডলার।

ফুকুশিমার পারমাণবিক বিপর্যয়: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেরনোবিলের কথা সবাই ভুলে যায়। এর ফলে নতুন করে আরো অনেক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু আবারো বিপর্যয় দেখা যায় ফুকুশিমার দাইচি পারমাণবিক কেন্দ্রটিতে। ২০১১ সালের ১১ মার্চ ২.৪৬ মিনিটে যেন প্রলয় শুরু হয়েছিল জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। প্রথমে প্রচন্ড ভূমিকম্পের ফলে (রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৯.৩) সুনামি শুরু হয়। পারমাণবিক চুল্লী ছিদ্র হয়ে চারপাশে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। ৩টি রিঅ্যাক্টর দূর্ঘটনায় পড়ার ফলে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হয় এবং অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। জাপানের ফুকুশিমা অঞ্চলে শিশুদের টাইফয়েড, ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা জাপানের অন্যান্য অঞ্চলের শিশুদের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি।

বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: পাবনার রূপপুরে বাংলাদেশের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হতে যাচ্ছে। রাশিয়ার সহায়তায় তৈরি হতে যাওয়া এই কেন্দ্র থেকে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পরিশেষে: পারমাণবিক বিপর্যয়ের উপরোক্ত ঘটনাগুলো আমাদের জন্য একটি সংকত দেয় যে, কোন দেশ যদি পারমাণবিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে চায় তাদের প্রথমে দরকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং দক্ষ শ্রমিক। যদিও প্রতিটি দেশই কম খরচ বা কম জ্বালানি ব্যবহার করে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায়, তবে তার জন্য পারমাণবিক চুল্লী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে তার অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ কেড়ে নেয় অনেক বেশি প্রাণ ও সম্পদ এবং যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবা যায় না। তার জন্য সময় লাগে শত শত বছর। তার প্রতিচ্ছবি আমরা হিরোশিমা, নাগাসাকি, ফুকুশিমা ও চেরনোবিলের বিস্ফোরণের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছি। তারপরও সেখানে জীবন কতটুকু স্বাভাবিক হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

উপরে আমরা পারমাণবিক বিপর্যয় নিয়ে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম, তা ঘটেছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে, যেখানকার মানুষগুলো দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ন এবং নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে। এতদ্সত্ত্বেও তারা তাদের দেশে দূর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। এর বিপরীতে আমাদের দেশের মানুষ, যারা অনেকে দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ন, কিংবা নিয়মানুবর্তী নয়, এবং যারা কাজ করতে চায় না ও কর্মফাঁকি যাদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের নিয়ে পারমাণবিক চুল্লী বানানোর যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। প্রস্তাবিত রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রাজশাহী থেকে ১০০-১১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানে বিপর্যয় ঘটলে আশে পাশের কয়েকশত কিলোমিটারসহ তার চতুর্দিক বসবাসযোগ্য থাকবে না। তাছাড়া সরকার আরও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যা আমাদের ছোট ও অতি ঘন বস্তিসম্পন্ন দেশের জন্য কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে, তা গভীরভাবে দেখা দরকার বৈ-কি।

কর্ম উন্নয়ন ও গভর্ন্যান্স প্রকল্পে আইসিটি এর কৌশলগত প্রয়োগ : একটি প্রশিক্ষণ কোর্স

ড. মো. ফজলুল হক ও নাজমুল হক[১]

আইসিটি এর কর্ম উন্নয়ন ও গভর্ন্যান্স প্রকল্প বা LICT (Leveraging ICT for Growth Employment and Governance Prgogram) হচ্ছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর একটি প্রকল্প যা টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চলমান আছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগে বাংলাদেশকে উন্নত করা এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা- যাতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নতিলাভ করতে পারে। LICT প্রকল্পের আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ কর্মশক্তি তৈরি করা। এটি ৫৭২.৪৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প, যাতে বিশ্ব ব্যাংক থেকে ৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ নেওয়া হয়। LICT প্রকল্পটি বাংলাদেশে ২০১৮ সালের মধ্যে শেষ হবার কথা রয়েছে।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত প্রোগ্রামের একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সটি করার সুযোগ পেয়েছিল, যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ যেমন- logo design, website template, brochure, flyer, business card এবং mobile design কিভাবে করতে হয়, তারা জানতে এবং শিখতে পেরেছিল। ক্লাসের ব্যাপ্তিকাল ছিল দৈনিক ৪ ঘণ্টা । এই কোর্সটি ছিল মূলত ১৬০ ঘণ্টার, যেটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল যথা ১০০ এবং ৬০ ঘণ্টা । তার মধ্যে ১০০ ঘন্টার কোর্সে Technical Part এ গ্রাফিক্স ডিজাইনভিত্তিক কাজ, এবং ৬০ ঘন্টার কোর্সে Soft Skill সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শিখেছিল। এই কোর্সটি ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে শুরু হয়ে (মাঝে মাঝে বিরতিসহ) অক্টোবর ২০১৭ সালে শেষ হয়েছে। এই গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সটি করার পর একটি পরীক্ষা নেওয়া হয় যাতে উত্তীর্ণ হলে ওয়াশিংটন ডিসি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়- যা অত্যন্ত মূল্যবান। কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি নিচের সারণিতে দেখানো হলো:

ছাত্র-ছাত্রীর নাম	রোল নম্বর	বর্ষ
১. নাজমুল হক	১৩০৩৬৬৬৬	মাস্টার্স
২. শাহাদাত হোসাইন	১২০২৬৬৭৯	মাস্টার্স
৩. কায়ছার আহমেদ	১৩০৩৬৬৪০	মাস্টার্স
৪. রানা বিশ্বাস	১৩০৮৬৬১৪	মাস্টার্স
৫. আশরাফুল ইসলাম	১৩০৬৬৬১৪	মাস্টার্স
৬. শুভ্রা শাওলিন	১৩২২৬৬৭৬	মাস্টার্স
৭. শেফাত হাসান	১৩০২৬৬২৪	মাস্টার্স
৮. তামান্না হাবিবা	১৩২২৬৬৮২	মাস্টার্স
৯. এনামুল হক	১৩০১৬৬৩০	মাস্টার্স
১০. শায়লা আক্তার চৌধুরী	১২২০৬৬৭১	মাস্টার্স
১১. সাদিয়া আফরিন রিমি	১২২০৬৬৩৬	মাস্টার্স
১২. নাজমুজ সাকিব সোহাগ	১৩০৯৬৬১৮	মাস্টার্স
১৩. উম্মে হাবিবা মোস্তারী	১১২১৬৬৪৮	মাস্টার্স
১৪. সোহেল রানা	১২০৬৬৬২৮	মাস্টার্স
১৫. রেশমা আক্তার	১৩২২৬৬০৫	মাস্টার্স
১৬. মুনছুর হক	১২০৮৬৬৫৬	মাস্টার্স
১৭. শাহিদা আক্তার	১৩২০৬৬৮৪	মাস্টার্স
১৮. তপন কুমার ঘোষ	১৩০২৬৬২	মাস্টার্স
১৯. সৈয়দা হোমাইরা কানিজ	১৩২০৬৬৬০	মাস্টার্স
২০. কানিজ ফাতেমা	১৩২৫৬৬৭০	চতুর্থ বর্ষ
২১. মিনাক্ষী হালদার	১৪২৩৬৬১৯	চতুর্থ বর্ষ
২২. রুবাইয়া ইসলাম	১৪২৪৬৬৫৯	চতুর্থ বর্ষ
২৩. প্রিয়ন্তী মল্লিক	১৪২০৬৭০৯	চতুর্থ বর্ষ
২৪. নিবেদিতা পাল	১৪২৪৬৬৯৪	চতুর্থ বর্ষ
২৫. মোস্তাফিজুর রহমান	১৩০২৬৬৬৩	চতুর্থ বর্ষ
২৬. গোরাচাঁদ গোস্বামী	১৪০৯৬৬৯৯	চতুর্থ বর্ষ
২৭. জাহাঙ্গীর আলম	১৪০২৬৬১২	চতুর্থ বর্ষ

[১]এমএস (ক্রপ প্রোটেকশন শাখা), ২০১৬ এর শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-এর জন্য প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাঃ বিঃ -এর তথ্য-উপাত্ত সংযোজন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ প্রণয়নের জন্য প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা ও প্রকাশিত ডকুমেন্টের নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সেপ্টেম্বর ২০১৭-তে প্রেরণ করা হয়।

গবেষণা ও প্রকাশনা: বিভাগে ২০১৭ সালে সমাপ্ত গবেষণা ও প্রকাশনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিভাগ	গবেষণা/প্রকাশনার (প্রকাশিত) এর বিবরণ	সংখ্যা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ	১. নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প	৮টি
	২. দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প	-
	৩. বিদেশী সংস্থার সাহায্যে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প	১টি
	৪. মাস্টার্স পর্যায়ে অভিসন্দর্ভ	৬টি
	৫. এমফিল পর্যায়ে অভিসন্দর্ভ	২টি
	৬. পিএইচডি পর্যায়ে অভিসন্দর্ভ	৩টি
	৭. পিয়ার রিভিউকৃত দেশী ও বিদেশী সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ	১৭টি
	৮. প্রকাশিত পিয়ার রিভিউকৃত জার্নাল ও সাময়িকী	১টি
	৯. প্রকাশিত বই	৬টি
	১০. প্রকাশিত ইলেকট্রনিক সাময়িকী/বই	-
	সর্বমোট=	৪৪টি

১. নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প: ৮টি

1. Title: Seasonal bird diversity of Padma River Charland of Rajshahi District.
   Project Director: Prof. Dr. Selina Parween; Associate Researcher: Prof. Dr. AM Saleh Reza.
   Funded by the UGC through RU Research Grant Programme.
2. Title: Antibiogram profiles of bacterial isolates from poultry environment in Rajshahi Metropolis, Bangladesh.
   Project Director: Prof. M. Saiful Islam, Research Associate: Dr. Sharmin Mustari.
   Funded by the UGC through RU Research Grant Programme.
3. Title: Insect conservation under the changing climate in Bangladesh.
   Project Director: Prof. Dr. Bidhan Chandra Das.
4. Title: Use of microorganisms for biodegradation of sugar-mill effluent to reduce environment pollution.
   Project Director: Prof. Dr. A. K. Saha; Associate Researcher: Dr. Md Fazlul Haque.
   Funded by the Ministry of S & T, GoB.
5. Title: Bioremediation perspective of textile dyes by indigenous bacteria.
   Project Director: Prof. Dr. A. K. Saha.
   Funded by: The Ministry of Education, GoB (March 2016-February 2018).
6. Title: Effect of insecticide on immune system of *Channa punctatus*
   Project Director: Prof. Dr. Md. Habibur Rahman; Associate Researcher Prof. Dr. Md. Anisur Rahman
   Funded by: UGC/RU (continuing)
7. Title: An epidemiological survey for identification of risk factors for extrapulmonary tuberculosis in Bangladesh.
   Project Director: Dr. Md. Fazlul Haque.
   Funded by the Ministry of S & T, GoB.
8. Title: Isolation of bacteria from different poultry feeds and their probable contamination of chicken reproductive tracts and eggs.
   Project Director: Dr. Moni Krishna Mohanta.
   Funded by the UGC through RU Research Grant Programme.

২. দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প: নাই

৩. বিদেশী সংস্থার সাহায্যে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প: ১টি

1. **Title:** Mass rearing and control strategies for Indian meal moth *Plodia interpunctella* (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) minimizing their dormancies. As a part of Coordinating Research Programme on Dormancy Management to Enable Mass-rearing and Increase Efficacy of Sterile Insects and Natural Enemies.
   Project Director: Prof. Dr. Md. Mahbub Hasan
   Funded by: FAO/IAEA (Project period: 2014-continuing).

৪. মাস্টার্স পর্যায়ে অভিসন্দর্ভ: ৬টি

1. Title: Characterization of the bacterial isolates from poultry feeds and reproductive organs of the broiler hens in Rajshahi, Bangladesh;
   Supervisor: Prof. Dr. M. Saiful Islam;
2. Title: Abundance and diversity of Dermaptera in Rajshahi District, Bangladesh.
   Supervisor: Prof. Dr. Bidhan Chandra Das;
3. Title: Abundance and diversity of Manitidae in Rajshahi District, Bangladesh.
   Supervisor: Prof. Dr. Bidhan Chandra Das;
4. Title: Growth and survival rate of two indigenous fish species with three different feeds under tank condition and detection of heavy metals from the fish and the feeds.
   Supervisor: Dr. Sabina Sultana;
5. Title: Growth and survival rate of two exotic fish species with three different feeds under tank condition and detection of heavy metals from the fish and the feeds.
   Supervisor: Dr. Sabina Sultana;
6. Title: A study on extraction of antimicrobial agents from mud nest of insects.
   Supervisor: Dr. Md. Fazlul Haque;

৫. এমফিল পর্যায়ে অভিসন্দর্ভ : ২টি

1. Diversity and abundance of Odonata in Rajshahi District, Bangladesh.
   Supervisor: Prof. Dr. Bidhan Chandra Das;
2. Decolourizing of sugar mill effluents by microorganisms.
   Supervisor: Dr. Md. Fazlul Haque.

৬. পি-এইচ.ডি পর্যায়ে অভিসন্দর্ভ: ৩টি

1. Toxicological evaluation of some insecticides and their combined action with *Azadirachtin* against the lesser mealworm, *Alphitobius diaparinus* (Panzer). Supervisor: Prof. Dr. A. S. M. Shafiqur Rahman; Fellow; Rogena Yeasmin.
2. Present status of fish processing industries of Khulna, Bangladesh. Supervisor: Prof. Dr. Selina Parween; IBSc Fellow: Snigdha Sharmeen.
3. Ecological characterization of indigenous *Rhizobium* populations in Rajshahi Area. Supervisor: Prof. Dr. Ananda Kumar Saha; Co-Supervisor: Prof. Dr. Md. Anisur Rahman. Fellow: Ali Mohammad Nushair.

৭. পিয়ার রিভিউকৃত দেশী ও বিদেশী সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ: ১৭টি

1. Ahsan, M.K., Alam, M.M. & Parween, S. 2016. Neem leaf juice as bio-safe anaesthetic against two live fish, *Anabas testudineus* and *Channa punctatus*. *Int. J. Aquat. Biol.* **4**(4): 233-238.
2. Ashaduzzaman, Huda, M.D., Rahman, M.A., Hossain, M.M., Neela, F.A., Sultana, S., Akther, S. & Rahman, M.H.. 2016. Effect of carbofuran on haematological parameters of channa punctatus (bloch). *Int. J. Pure Appl. Zool*. **4**(3): 282-288.
3. Ferdous, J., Islam, W. & Parween, S. 2016. Effect of two chitin synthesis inhibitors on the reproductive potential of two successive generations of *Tribolium castaneum* (Herbst). *Trop. Agric. Res. Ext.* **19**(1): 16-21.
4. Haque, R., Islam, W. & Parween, S. 2016. Antibacterial potency screening of *Capparis zeylanica* Linn. *J. Coastal Life Med.* **4**(2): 157-160. doi:10.12980/jclm.4.2016j5-155.
5. Haque, M.F. & Zaman, A.K.B. 2017. The factors affecting the occurrence of skin diseases in Rajshahi, Bangladesh. *Int. J. Sci. Res. Methodol. (Ijsrm.Human)*. **6 (1)**: 63-71.
6. Islam, K., Elora, B., Al-Mamun, M.A. & Islam, M.S. 2016. Response on lifespan and offspring production in the transgenic roundworm Caenorhabditis elegans to violet-blue irradiation exposure. *Imperial J. Interdisc. Res.* **2**(7): 1063-1070.

7. Islam, M.S. & Mustari, S. 2016. Evaluation of productivity, disease incidence and profitability of three chicken breeds (*Gallus domesticus* L.) under smallholders' farm conditions in Rajshahi, Bangladesh. *Int. J. Sci. Res. Env. Sci.* **4**(5): 153-163.
8. Islam, M.S. & Rahman, M.M. 2016**.** Diatomaceous earth-induced alterations in the reproductive attributes in the housefly *Musca domestica* L. (Diptera: Muscidae). *Elixir Appl. Zool.* **96**: 41941-41944.
9. Mahdi, S.H.A. 2016. Ovicidal and repellent effects of some spice powders against the *Callosobruchus chinensis* L. and *C. maculatus* (F.). *Bangladesh J. Zool.* **44**(1): 51-59.
10. Mohanta, M.K., Saha, A.K., Haque, M.F., Mahua, S.A. & Hasan, M.A. 2015. Status of antibiotic sensitivity pattern of clinically isolated bacteria collected from Rajshahi City, Bangladesh. *Univ. j. zool. Rajshahi. Univ.* **34**: 1-5.
11. Mohanta, M.K., Islam, M.S., Saha, A.K., Khatun, S. & Khatun, Z. 2016. Antibiogram profiles of bacterial isolates from poultry feeds and moribund hens in Rajshahi, Bangladesh. *Imperial J. Interdisc. Res.* **2**(5): 41-46.
12. Nushair, AM, Saha, AK, Rahman, MA, Mohanta, MK & Haque, MF. 2017. Characterization of Indigenous Rhizobium Strain Isolated from lentil in Rajshahi, Bangladesh. *Asian J. Adv. Basic Sci.* **5**(1): 21-25.
13. Rahman, M.A. 2015. Movement of chick embryo (*Gallus domesticus* L.) towards the blunt end of egg in relation to shell pore density and air cell size. *Univ. j. zool. Rajshahi Univ*. **34**: 7-13. (Published in 2016).
14. Rahman, M.M., Islam, M.S. & Mustari, S. 2016. Adverse effects of diatomaceous earth on immature duration, mortality, adult deformity and salivary gland morphometrics in *Musca domestica* L. *Int. J. Sci. Eng. Appl. Sci.* **2**(6): 70-76.
15. Rahman, S. & Islam, M.S. 2017. Life-history traits of two medically important insects *Culex quinquefasciatus* Say and *Musca domestica* L. influenced by temperature and humidity. *Int. J. Sci. Eng. Appl. Sci*. **3**(5): 135-142.
16. Saha, A.K., Rahman, S.M., Mohanta, M.K., Haque, M.F., Naz, S. & Ruhi, R.A. 2016. Isolation and characterization of arsenic resistant bacteria from contaminated soil. *Asian J. Adv. Basic Sci*. **4**(2): 113-122.
17. Saha, A.K., Sultana, N., Mohanta, M. K., Mandal, A., Haque, M. F. 2017. Identification and characterization of azo dye decolourizing bacterial strains, *Alcaligenes faecalis* E5.Cd and A. faecalis Fal.3 Isolated from Textile Effluents. *Amer. Sci. Res. J. Eng. Technol. Sci. (ASRJETS)*.**31(1)**:163-175.

৮. প্রকাশিত পিয়ার রিভিউকৃত জার্নাল ও সাময়িকী: ১টি

1. University Journal of Zoology, Rajshahi University *Univ. j. zool. Rajshahi Univ*. ISSN 1023-6104). Vol . **34** (published in December 2016).

৯. প্রকাশিত বই: ৬টি

1. Islam, M.S., Kundu, S.K. & Sarder, M.J.U. 2016. *Production Attributes of Dairy Cattle From Some Areas of Bangladesh*. Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-330-00280-7. 283 pp.
2. Islam, M.S. & Kabir, M.A. 2017. *Productivity of Chicken Breeds: Scenarios in Northern Bangladesh*. Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-330-02968-2. 238 pp.
3. Islam, M.S. & Islam, K. 2017. *Genetic Studies on a Ladybird Beetle from Bangladesh*. Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-330-04284-1. 162 pp.
4. Islam, M.S. & Hoque, M.M. 2017. Evaluation of Cypermethrin Toxicity in Lab Mice. Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-330-05569-8. 117 pp.
5. Islam, M.S. & Khan, H.S. 2017. *Radiation-induced Changes in House Fly Reproduction.* Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-330-07826-0. 387 pp.
6. Parween, S. & Reza, A.M.S. 2016. *বাংলাদেশের পাখির নামকরণ: প্রেক্ষাপট*. Maya Neer Prokashoni, Rajshahi. 373 pp.

[তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পরিবেশনা: প্রফেসর ড. এম. সাইফুল ইসলাম]

বি.এস-সি (সম্মান) ৪৭তম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাসফর ২০১৭

প্রফেসর ড. মো. গোলাম মোর্ত্তুজা ও ড. মো. আরিফুল হাসান

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ বি.এস-সি (সম্মান) শ্রেণির সিলেবাসের অপরিহার্য অংশ হিসাবে শিক্ষা সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমাদের এই শিক্ষা সফরের তারিখ ঠিক হলো ৭ই অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত। সফরে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে ছিল ২১ জন ছাত্র, ৯ জন ছাত্রী এবং ১ জন গবেষণা পরিচারক। পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে দলপতির দায়িত্ব পালন করি আমি প্রফেসর ড. মো. গোলাম মোর্ত্তুজা। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্তমান বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. খালেকুজ্জামান স্যার, প্রফেসর ড. মোহা. মাইনুল হক এবং ড. মো. আরিফুল হাসান। আমাদের সাথে আরো ছিলেন ড. মো. খালেকুজ্জামান স্যারের সহধর্মিণী ইসমত আরা চৌধুরী এবং তাদের নাতনী। সেই সাথে ছিলেন ১ জন ট্যুর পরিচালক এবং গাড়ীর ২ জন স্টাফ। সব মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা সফরের সদস্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৪০ জন।

নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ ৭ই অক্টোবর বেলা ৩.০০ টার সময় আমরা ৩য় বিজ্ঞান ভবনে অবস্থিত বিভাগের সামনে থেকে বাসযোগে রওনা হই এবং লম্বা পরের দিন অর্থাৎ ৮ তারিখ দুপুরে প্রথম গন্তব্য স্থান কক্সবাজার পৌঁছাই এবং ওয়েল প্যালেস রিসোর্ট এ উঠি। কক্সাবাজারেই আমরা ৪ দিন অবস্থান করি। ৮ই অক্টোবর সকাল ৬.০০ টায় আমরা প্রথমবারের মত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বিভিন্ন প্রাণী সংগ্রহ করি। সমুদ্র সৈকতে যাবার পূর্বে আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন উপদেশ, দিক নির্দেশনা এবং সমুদ্রতট ও উপকূলের বাস্তুতাত্ত্বিক বর্ণনা দেই। কক্সবাজারে অবস্থানকালে প্রত্যেক দিন আমরা সকালে এবং বিকালে সমুদ্র সৈকতে যাই এবং সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করি। কক্সবাজারে ১লা অক্টোবর সকালে আমরা ফিশ হারবার পরিদর্শন শেষে হীমছড়ি এবং ইনানী বীচে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী এবং তাদের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ করি।

১১ই অক্টোবর তারিখ সকালে আমরা কক্সবাজার থেকে বাসযোগে টেকনাফের উদ্দেশ্যে রওনা হই। টেকনাফ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। পাহাড়ে ঘেরা টেকনাফের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে। ঐদিন আমরা নাফ নদী পরিদর্শন করি এবং সাথে টেকনাফে বার্মিজ মার্কেট পরিদর্শন করি। এই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে বার্মা এবং চীনের তৈরি অনেক দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ

১২ই অক্টোবর সকাল ৭ টায় আমরা বাসযোগে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথিমধ্যে কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকোরিয়া উপজেলার ডুলাহাজরা ইউনিয়নে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক পরিদর্শন করি, যা ছাত্র-ছাত্রীদের সাফারি পার্ক সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেয়। এখানে আমরা চিত্রা হরিণ, সাদা ঈগল, বোস্তামি কাছিম, অজগর সাপ এবং ঘড়িয়ালসহ বেশ কিছু বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণী পর্যবেক্ষণ করি এবং এখানে অবস্থিত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম পরিদর্শন করি। এদিন বিকালে আমরা অনেক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বৌদ্ধদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান *গোল্ডেন টেম্পল* পরিদর্শন করি। ১৩ই অক্টোবর সকালে আমরা খোলা জীপে করে যাত্রা শুরু করি এবং মেঘলা ইকোপার্ক, চিম্বুক প্রাণী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা সুউচ্চ রাস্তা দিয়ে প্রায় ৩৫০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত নীলগিরিতে পৌঁছাই। সেখানে আমরা কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করি এবং দুপুরের খাবার খাই। এ স্থানের পাহাড়ী পরিবেশের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। নীলগীরি

থেকে ফেরার পথে আমরা পাহাড়ী ঝরণা শৈলপ্রপাত পরিদর্শন করি। বেলা ৩ টার পর পাহাড়ের কোল ঘেষা একটি পাকা, ভয়ঙ্কর কিন্তু মনোমুগ্ধকর রাস্তা অতিক্রম করে সন্ধ্যার দিকে আমাদের বান্দরবানের হোটেলে ফিরে আসি। এদিন আমরা রাত্রি বেলায় বান্দরবান থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই; চট্টগ্রামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ও বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর মাজার পরিদর্শন করি এবং রাত্রি বেলায় চট্টগ্রামে অবস্থান করি।

পরদিন ১৪ই অক্টোবর প্রাতরাশ সেরে আমরা বাসযোগে চট্টগ্রামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন, চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর, সমুদ্র সৈকত, পতেঙ্গা বিমান বন্দর, বিদেশগামী জাহাজ, তেল শোধানাগার ইত্যাদি পরিদর্শন করে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং ১৫ তারিখ ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা রাজশাহী পৌঁছাই।

আমাদের এই সফর ছিল শিক্ষামূলক এবং আনন্দদায়ক, কারণ এই ভ্রমণ একদিকে যেমন বাস্তবিক জ্ঞান অর্জনে প্রচুর সহায়তা করেছে, অন্যদিকে যথেষ্ট আনন্দও দিয়েছে।

Neuroscience Meeting and Symposium at Chicago

Mohammad Abdullah*

[*Former student of Zoology, RU; currently pursuing PhD at Graduate School of Medical Science, Nagoya City University, Japan.]

It was my pleasure to attend the 45th Annual Meeting and a symposium on Alzheimer's disease organized by the Society for Neuroscience held in Chicago, USA, from 17 to 21 October 2015. The meeting gave me a tremendous learning experience that not only enriched my knowledge but it also enhanced my understanding of biology as well.

The conference covered different projections of neurochemistry including biochemical, clinical, chemical, molecular biological and pharmaceutical aspects. It had a lot of participants from all over the world, who presented their up-to-date works in the field of neurochemistry. It was an excellent environment to share my research experiences with others and gain further knowledge from world class experts in this field. For instance, I attended a group seminar and thus got the chance to meet many leading scientists and exchanged views about my research outcome and asked them about how to generate innovative research ideas. Therefore, this was a unique opportunity for me to discuss with a number of academics and professionals from different countries who had similar research interests.

I submitted an abstract entitled 'Effect of Aβ on release of exosome and apoE from astrocytes in culture', which was accepted for an oral presentation. My results indicated that exosome release was significantly reduced by Aβ1–42 treatment in cultured astrocytes, accompanied by an increased JNK phosphorylation; whereas apoE-HDL release remained unchanged. A JNK inhibitor restored the decreased levels of exosome release induced by Aβ treatment to levels similar to those of control, suggesting that Aβ1–42 inhibits exosome release *via* stimulation of JNK signal pathway. This is because exosomes are shown to remove Aβ in the brain. My findings suggested that increased Aβ levels in the brain may impair the exosome-mediated Aβ clearance pathway.

Another major benefit of attending this conference was it afforded an opportunity to get together, interact and exchange findings and views during the conference sessions, coffee breaks and conference dinner. I had exchanged contact information with a number of scientists, graduate students and postdoc researchers. Undoubtedly, this was an amazing experience that allowed me to gain insight into knowledge of neuroscience, which provided me with novel research ideas and opened networking avenues. So, I would like to express my deepest appreciation to my honourable Professor Makoto Michikawa and Nagoya City University for supporting my travel to America to attend this conference and gain this invaluable experience.

অস্তিত্বের প্রশ্নে যখন জীবন

প্রফেসর ড. মো. নূরুল ইসলাম

পরিবেশ

সৌরজগতের মধ্যে আমাদের আবাসস্থল পৃথিবীই সবচেয়ে আকর্ষণীয় গ্রহ, কারণ এখন পর্যন্ত যতদূর জানা যায় শুধুমাত্র এই গ্রহেই জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। আলো, বাতাস, পানি, মাটি, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বৈচিত্র্যময় অসংখ্য জাতের উদ্ভিদ, প্রাণী সহকারে এই পৃথিবীর বুকে প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি অতুলনীয় সুন্দর ও ছন্দময় দৃশ্যপটের সৃষ্টি করেছে। বহু কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পদরাযী মানব জাতিকে শক্তি ও সম্পদ সরবরাহ করে শিল্প, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে চরম উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম করেছে। ক্রমাগত এই প্রকৃতি থেকে সকল প্রকার সম্পদ লুণ্ঠন করে মানুষ তার জীবন যাপনের জন্য উন্নত থেকে উন্নততর আরাম-আয়েশ খুঁজে নিয়েছে।

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন উপাদানগুলো একে অন্যের সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের টেবিলে সজ্জিত খাবার, শ্বাস গ্রহণের অক্সিজেন, গায়ের কাপড়, লেখাপড়ার কাগজ, রোগ নিরাময়ের ওষুধ, নিরাপদ আশ্রয়, চিত্তবিনোদনের সবুজ প্রকৃতি, প্রভৃতি প্রতিমুহূর্তের অবিচ্ছন্ন সঙ্গী পরিবেশেরই বিভিন্ন উপাদান। অন্যদিকে আমরা নিজেরাও পরিবেশ নামক পরিবারের অন্যতম সদস্য। কিন্তু মানব জাতির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আগ্রাসী ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রকৃতির এই সুসংবদ্ধ সম্পদরাশী নিঃস্ব প্রায় এবং পরিবেশ আজ ভীষণভাবে বিপন্ন আমাদের অদূরদর্শী কার্যকলাপের কারণে। কী ঘটছে আমাদের কর্মকান্ডে?

পরিবেশ দূষণ

বলগাহীন পরিবেশ দূষণ এই সুন্দর প্রকৃতিকে বিপন্ন করার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আদিম যুগে মানুষ ছিল পরিবেশের অধীন; পরিবেশই মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করত এবং টিকে থাকার জন্য মানুষকে পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট থাকতে হত। মানব সভ্যতার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় ফলমূল সংগ্রহ বা পশু শিকার থেকে কৃষিকাজ শিখতে মানুষের প্রায় দশ লক্ষ বছর লেগেছিল। সভ্যতার বিকাশ ও বিজ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথে মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে ক্রমে বশ করতে শিখল। কৃষিকাজ আয়ত্ব করে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পৌঁছুতে মানুষের দশ-বারো হাজার বছর লেগেছে।

সভ্য মানুষ যখন সংঘবদ্ধভাবে ঘরবাড়ী বানিয়ে লোকালয় প্রতিষ্ঠা করল, কৃষিকাজে দক্ষ হয়ে উঠলো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সক্ষম হল তখন থেকেই সে ক্রমশঃ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের- বিশেষ করে বনসম্পদের উপর বেশী বেশী আঘাত হানতে শুরু করলো। তাই সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পরিবেশের গাছপালা দ্রুত কমতে শুরু করলো। এখনো প্রতিবছর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উন্নত বনসম্পদের প্রায় ৭০,০০০ বর্গ কিলোমিটার নিশ্চিহ্ন হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। বর্ধিত জনসংখ্যার ভোগবিলাসের চাহিদা মেটাতে স্থাপিত হল বড় বড় কল কারখানা আর উৎপাদিত হতে লাগলো হাজারো প্রকার দ্রব্যসামগ্রী। এই সব কলকারখানার আর দিগন্ত বিস্তৃতি কৃষিক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, গ্যাস, ধোঁয়া, ধূলিকণা ইত্যাদি নানা প্রকার বর্জ্যপদার্থ উপজাত হিসেবে সঞ্চিত হতে শুরু করলো এই পরিবেশে। এক হিসাব মতে প্রতিবছর ২০ কোটি টনের বেশী কার্বন মনোক্সাইড, ৫ কোটি টন হাইড্রোকার্বন, ১৫ কোটি টন সালফার ডাইঅক্সাইড এবং ১২ কোটি টন ভস্মীভূত ছাই বিভিন্ন শিল্পকারখানা থেকে পরিবেশ ও বায়ুমন্ডলে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। এরই কিছু অংশ আবার বৃষ্টির পানিতে ফিরে আসছে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসিডবৃষ্টি রূপে। মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখী, কলকারখানা, যানবাহন ও কৃষিক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থ এই পৃথিবীকে আবর্জনা নিক্ষেপের স্থান বা ডাষ্টবিনে পরিণত করেছে। আজকাল প্রায়ই আমরা গ্রীনহাউস এফেক্ট এবং ওজোনস্তর ধ্বংস হবার কথা শুনি- পরিবেশ দূষণই এর জন্য দায়ী।

গ্রীন হাউস এফেক্ট

বায়ু পরিবেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুমন্ডল এই পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে, মহাকাশ ও তারকাপুঞ্জ থেকে আসা বিভিন্ন স্বল্পদৈর্ঘ্যের মারাত্মক বিকিরণ থেকে রক্ষা করছে। বায়ুর জন্য পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে আছে- শ্বাসকার্যের জন্য আমরা প্রত্যেকে দৈনিক গড়ে ১৪ থেকে ১৮ কেজি বাতাস গ্রহণ করি। কিন্তু মানব সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঠ-কয়লা, খনিজতেল, গ্যাস ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও কলকারখানার বায়ুদূষণের ফলে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, মিথেন, ইথেন, বিউটেন, বেনজিন, ইত্যাদি নানা প্রকার গ্যাস, কার্বন ও ধূলিকণা, সালফার যৌগ, ইত্যাদির পরিমাণ বায়ুমন্ডলে ক্রমশই বাড়ছে। শিল্প বিপ্লবের শুরুতে বাতাসে প্রতি দশ লক্ষ ভাগের ২৫০ ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল যা ১৯৫৮ সালে দাঁড়ায়

৩১৫ ভাগে এবং ১৯৮০ তে দাঁড়ায় ৩৬০ ভাগে। শীতপ্রধান দেশে 'গ্রীন হাউস' বা 'কাঁচ ঘরে' কাঁচ যেমন উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে, পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমন্ডল তেমনি পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত দীর্ঘ তরঙ্গরশ্মি শোষণ করে এবং সেই শক্তি বিকিরণ করে বায়ুমন্ডল পৃথিবীর উষ্ণতা বজায় রাখে। বায়ুমন্ডলে অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন, ইত্যাদি গ্যাসও বেশী বেশী দীর্ঘ তরঙ্গরশ্মি শোষণ করে বেশী তাপশক্তি পৃথিবী পৃষ্ঠে বিকিরণ করছে। পরিবেশ দূষণ যতই বাড়বে, ততই এই সব গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে সঞ্চিত হবে এবং ততই বেশী শক্তি তাপ হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে এবং একেই 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' বলে। বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন তথ্য ও গবেষণা থেকে ধারণা করছেন যে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা গড়ে ৩° সে. বৃদ্ধি পেতে পারে। এই বৃদ্ধি অত্যাধিক, কারণ বিগত ১২০ বছরের পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছিল গড়ে মাত্র ০.৫° সে.- কারণ ঐ সময়ে বায়ুমন্ডলে দূষণের মাত্রা এখনকার তুলনায় খুবই কম ছিল। অদূর ভবিষ্যতে এধরণের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পৃথিবীর আবহাওয়ায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। শীত প্রধান দেশগুলোতে শীতকাল উষ্ণতর ও সংক্ষিপ্ত হবে, গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ ও অত্যাধিক উষ্ণ হবে। গ্রীষ্ম প্রধান নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাবে কিন্তু বাংলাদেশের মত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে যাবে এবং খরা দেখা দিবে। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং উপকূলবর্তী নীচু এলাকা প্লাবিত হবে। উষ্ণতা বৃদ্ধি উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতেও প্রতিকুল অবস্থা, বাস্তুতন্ত্রে অনিয়মের সৃষ্টি করবে।

ওজোনস্তর ধ্বংস

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় ওজোন নামক গ্যাসের একটি স্তর আছে। ওজোন গ্যাসের এই স্তর পৃথিবীতে জীবনের টিকে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই গ্যাসের স্তরই সূর্যপৃষ্ঠ থেকে আসা আল্ট্রাভায়োলোট নামক ক্ষতিকর রশ্মি শোষণ করে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের গাছপালা ও প্রাণীদের রক্ষা করে। কিন্তু বায়ু দূষণকারী কিছু কিছু গ্যাস যেমন ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি বায়ুমন্ডলে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে এই ওজোন গ্যাস-স্তরকে ভেঙ্গে ফেলে। ফলে বেশী মাত্রায় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পড়ছে। এই ক্ষতিকর রশ্মি ক্যান্সার বৃদ্ধি করবে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন হ্রাস করবে এবং বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক অনিয়ম ও ক্ষতিসাধন করবে। বিশেষ করে মহাসমুদ্রে বিচরণকারী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককোষী উদ্ভিদ যারা প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে খাদ্য তৈরী করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী যারা খাদ্য শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তারা এই ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রে বিরাট সংকটের সৃষ্টি করবে। সমুদ্রের অনেক মাছ ও বৃহৎ প্রাণী ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হবে। তাছাড়া বিশাল উদ্ভিদ সম্প্রদায় ধ্বংস হলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রীন হাউস এফেক্ট ত্বরান্বিত করবে।

বন নিধন

পরিবেশ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ বন নিধন। উষ্ণ-মন্ডলীয় বনভূমি বর্তমান শতাব্দির শুরুতেও ১.৫ বিলিয়ন হেক্টর বিস্তৃত ছিল বর্তমানে তার অর্ধেকেরও বেশী নিশ্চিহ্ন। প্রতি বছরই ১০ থেকে ২০ মিলিয়ন হেক্টর নিশ্চিহ্ন হচ্ছে অধিক ফসলের ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এই বিশাল বনাঞ্চল। তাছাড়াও বনভূমি ভূমিক্ষয়, বন্যা, ঝড় নিয়ন্ত্রণে ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানুষ যে কত দ্রুত এবং নৃশংসভাবে তার পরিবেশ বিপন্ন ও ধ্বংস করতে পারে আফ্রিকার সাহারা মরু-অঞ্চল তার প্রমাণ। সাহারা অঞ্চলের জলবায়ু বহুকাল হতে এখনকার মত শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন ছিল। তা সত্বেও প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্বেও সাহারার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সবুজ তৃণভূমি বিরাজ করতো, সেখানে প্রচুর ছোট বড় বন্যপ্রাণী বাস করতো। গত কয়েক হাজার বছর ধরে সেখানে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তেমন কোন পরিবর্তনও হয়নি। তাই সাহারা অঞ্চলের মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অত্যাধিক গৃহপালিত পশুচারণ ও কৃষিকাজই এ অঞ্চলের অতিসূক্ষ্ম পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট করে, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের আচ্ছাদন ধ্বংস হয় এবং মরুকরণ প্রক্রিয়া বিস্তার লাভ করে।

অত্যাধিক খরাপীড়িত ও খরা-কবলিত অঞ্চলে নিবিড় শস্য উৎপাদন একমুখী রাস্তার মত। আফ্রিকার সাহেল, সাহারা ও সুদানের মরুভূমির শুরু যে প্রক্রিয়ায়, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি তারই পূর্বাবস্থা বলে প্রমাণিত। অনেক আবহাওয়াবিদ দেখিয়েছেন যে, সাহারা অঞ্চলে যেখানে উদ্ভিদ আচ্ছাদন একেবারেই কম সেখানে ভূ-পৃষ্ঠ হতে সূর্যালোক প্রতিফলন অধিক এবং এই প্রক্রিয়া সে স্থানে বৃষ্টিপাত হ্রাস করে। এভাবে উন্মুক্ত, বৃক্ষাচ্ছাদনহীন ভূপৃষ্ঠের প্রকারের সাথে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সুপ্রমাণিত হয়েছে। এ ধরণের সীমিত জলবায়ুর প্রভাবকে পরিবর্তন করতে হলে বৃক্ষাচ্ছাদন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উত্তর তিউনিসিয়ায় এধরণের ভূ-আচ্ছাদন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাগল পালন নিষিদ্ধকরণ উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত পক্ষীবিশারদ সলীম আলী বহুবিধ ঐতিহাসিক চিত্র, নথিপত্র ও দলিল থেকে প্রমাণ করেছেন যে মুঘল আমলে পঞ্চদশ শতাব্দিতে ও দিল্লীর আশে পাশেই বিস্তীর্ণ আর্দ্র তৃণভূমি ও উষ্ণ মন্ডলীয় বনভূমি ছিল সেখানে বিভিন্ন ধরণের বৃহৎ শিক্ষার যোগ্য পশুর আবাস ছিল। একইভাবে বর্তমানে বৃক্ষহীন বরেন্দ্র অঞ্চল এখন থেকে একশত বৎসর আগে কাঁটাপূর্ণ বনভূমি ছিল সেখানে প্রচুর বন্যপশু ও পাখীর বাস ছিল। মাত্র ৮০/৯০ বৎসরের মধ্যে এই ৮০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার কাঁটাবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে, বর্তমানে সেখানে মাত্র ০.২ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকা রয়েছে- কোন বনভূমি নেই। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পরিবেশে অতিরিক্ত সেচ তথা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষিকার্য দীর্ঘকাল পরিচালনা পরিবেশ বিনষ্টের অন্যতম কারণ।

আধুনিক কৃষি ও পরিবেশ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল দিক বিবেচনা করে শুধুমাত্র অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য নিবিড় শস্য ফলাতে গিয়ে অনেক সময় পরিবেশ বিপন্ন করা হয়। গত শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে খরাপীড়িত অঞ্চলের বিস্তার শুধুমাত্র অতিমাত্রায় সেচ প্রদানের দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব নয়। ভূতাত্ত্বিক ও প্রস্তুত পরীক্ষায় এটা সুপ্রমাণিত যে অতীতের সকল বৃহৎ সেচ প্রকল্প দীর্ঘজীবি হয়নি বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ প্রচেষ্টাই বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রত্যেক বৃহৎ সেচ প্রকল্পের প্রধান সমস্যা। বর্তমানে উন্নত ভূমি ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে পর্যাপ্ত নর্দমা তৈরি, জল নিষ্কাশন ও ভূগর্ভস্থ পানির তল নিয়ন্ত্রণ করে লবণাক্ততা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবুও সেটা আরও অনেক সমস্যা যেমন মাটির ভৌতগঠন ও রাসায়নিক চরিত্র পরিবর্তন করে এবং ভূমধ্যস্থ জীবাণু ও উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্প্রদায়ের জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এ সবই পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারে।

বৃহৎ সেচ প্রকল্পের জন্য অনেকক্ষেত্রে নদীর উপর বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ বা জলাধার নির্মাণ করা হয়। লবণাক্ততা বৃদ্ধি ছাড়াও এ ধরণের বৃহৎ সেচ প্রকল্প পরিবেশের উপর নানা প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ ধরণের প্রচেষ্টা ঐ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ হয়। যেমন মিশরের নীল নদের আসওয়ান বাঁধ। এই নদ প্রবাহিত প্রায় আশি হাজার মিলিয়ন ঘন মিটার বন্যার পানি, পলি ও জৈবদ্রব্যসহ প্রতিবছর ভূমধ্যসাগরের মোহনায় এসে মিশতো এবং সেখানে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মাছের একটি বৃহৎ প্রজনন ও পালন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। এই বাঁধ দেওয়ার ফলে বন্যার পানি প্রায় ৯৫ শতাংশই এখন জলাধারে, যার আয়তন প্রায় সোয়া এক মিলিয়ন একর, ধরে রাখা হয় ফলে সাগরের মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ভারতে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কাবাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের গঙ্গা নদীতে পানির অভাব ছাড়াও পদ্মার ইলিশ সহ অন্যান্য মাছের প্রজনন এবং বৃদ্ধিতে একই ধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

পানি দূষণ

জনসংখ্যা বলগাহীন বৃদ্ধির ফলে মানুষ সৃষ্ট বর্জ্যপদার্থ যেমন মল-মূত্র, গৃহস্থালীর দূষিত পানি, কঠিন ফেলে দেয়া বর্জ্যপদার্থ, পরিবেশ, বিশেষ করে পানি ও জলাধার দূষিত করছে। নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদির পানি এতই দূষিত হয়েছে যে এসব স্থানে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। আমাদের দেশে নদীর পানি অতি সহজেই দূষিত হয় কারণ শহর-বন্দর গ্রাম সকল স্থান থেকে গৃহস্থালীর ও কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ নর্দমা বাহিত হয়ে নদীতে পড়ে। এর সঙ্গে কলকারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ও ভারী ধাতু নদীতে প্রতিনিয়ত সোজাসুজি পতিত হয়। ভারতের গঙ্গা নদীকে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ প্রোগ্রামের (UNEP) দূষণ নির্ধারণ রিপোর্টে সবচেয়ে দূষিত নদী বলা হয়েছে। শিল্পাঞ্চল থেকে অনেক দূরেও এ নদীর পানিতে অতিরিক্ত পানি দূষণের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলের পানিতে দস্তা, তামা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, সিসা, ইত্যাদি বেশী পরিমাণে পাওয়া গেছে যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। শিল্পাঞ্চলের পাশে বা নিকটে এই নদীতে এসবের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কর্ণফুলী পেপার মিলের বর্জ্য, ঘোড়াশাল কারখানার বর্জ্য, বিভিন্ন কাগজকল, চিনিকল, রাসায়নিক শিল্প এবং ট্যানারী হতে নির্গত বর্জ্য নদীতে পড়ে প্রায়ই পানি দূষিত করে পরিবেশ বিপন্ন করছে।

আধুনিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর কৃষিব্যবস্থাও পরিবেশ দূষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিক্ষেত্র থেকে পানিতে ভেসে আসা রাসায়নিক যেমন পতঙ্গনাশক বিষ ও বিষের অবশিষ্টাংশ, রাসায়নিক সারের যৌগ যেমন ফসফেট, নাইট্রেট, ইত্যাদি মাটি ও পানিতে সংগৃহীত হচ্ছে। স্বল্প পরিমাণে উপস্থিত হলেও পরিবেশের কীটনাশক বিষ বিভিন্ন শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ ও পানির মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলে (Food Chain) স্থানান্তরিত হয়ে মাছ, পশুপক্ষী ও মানবদেহে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয় এবং দেহে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জলাধারে অতিরিক্ত নাইট্রেট ও ফসফেট সঞ্চিত হয়ে জলদূষণ করে, পানির স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট করে এবং অতিমাত্রায় শৈবাল, জলজ উদ্ভিদ ও জীবাণু বৃদ্ধির কারণ ঘটায় ও পানি দূষিত হয়। দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রকার মাছে ক্ষতরোগ, মাছের বংশ নাশ ও অন্যান্য জলজ ও প্রাণীর বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ এই দূষণের প্রত্যক্ষ ফল।

বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য আজকের জীবন ব্যবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ পলি ক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল গোত্রের ক্লোরিনেটেড এ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনের কথা উল্লেখযোগ্য। এ সকল রাসায়নিক বহু ধরণের শিল্প কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক ক্যাপাসিটর, ট্রান্সফর্মার, পেইন্ট, প্লাস্টিক, ইনসুলেটর, পতঙ্গনাশক, কালি, প্রলেপ ইত্যাদি হিসেবে এসকল রাসায়নিক বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনায় বাষ্প হিসেবে ছিদ্র পথে ছাড়াও সোজাসুজি এই ধরণের রাসায়নিক ক্রমাগত পানি, মাটি বায়ুমন্ডলে অবিরত প্রবেশ করছে। এরা অত্যন্ত ধীর গতিতে নষ্ট হয় বলে পরিবেশে ক্রমে এদের পরিমাণ বাড়ছে এবং শৈবাল, উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে সঞ্চিত হচ্ছে। নদ-নদীর পানিতে বাহিত হয়ে এই বিষাক্ত রাসায়নিক সমুদ্রের পানিতে জমা হচ্ছে- ১৯৮৮ সালের এক হিসাব মতে সমুদ্রের পানিতে প্রায় ২৩০ হাজার মেট্রিক টন এই রাসায়নিক, যা পি.সি.বি. নামে পরিচিত জমা হয়েছে। শরীরে মাত্রাধিক প্রবেশ করলে এ রাসায়নিক চামড়ায় প্রদাহ, ক্ষত ও যকৃতে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। দুর্ঘটনা ও অগ্নিকান্ডের সময় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে যে বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তাতে পি.সি.বি. উদ্ভুত ও ডাইবেনজোফুরান রাসায়নিক দ্রব্য প্রাণী দেহে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

দৈনন্দিন জীবনে দূষণ

আধুনিক জীবনযাত্রায় আরাম-আয়েশের সাথে সাথে আমরা অসংখ্য বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ দূষণের সম্মুখীন হচ্ছি। এ ধরণের দূষণক্ষম বিষাক্তদ্রব্যের তালিকা এতদীর্ঘ যে আজকের ছোট পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র দু'টি অতি সাধারণ দ্রব্য যা আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করছি তার কথা বলব। খনিজ তেল যান্ত্রিক যানবাহনে সর্বত্র ব্যবহৃত এর মধ্যে যে ভারী ধাতু যেমন সীসা রয়েছে তার ধোঁয়া রাস্তার ধূলিকণা ও বাতাসে মিশে এবং পরিশেষে মানবদেহে সঞ্চিত হয়। স্নায়ু, অস্থি ও রক্তে সঞ্চিত সীমা নানা প্রকার গুরুতর অসুখের কারণ। ধাতু ও অন্যান্য রাসায়নিক নির্মিত তৈজসপত্র ও বাসন রান্নাঘরের অপরিহার্য অংশ। এ্যালুমিনিয়াম এমনই একটি ধাতু যা থালাবাসন ও হাড়ি-পাতিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই ধাতু শরীরে শোষিত হয় না এবং মোটেও বিষাক্ত নয় ধারনার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং এ্যান্টাসিডরূপে বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে এ্যালুমিনিয়াম একটি বিষাক্ত পরিবেশ দূষণকারী মৌল হিসেবে চিহ্নিত। অতিরিক্ত পরিমাণে এই ধাতু স্নায়ুবৈকল্য ও স্নায়ুতন্ত্রে গন্ডগোলের কারণ হতে পারে। তাছাড়া শরীরের অতিরিক্ত এ্যালুমিনিয়ামের উপস্থিতি শরীরে থেকে অতিমাত্রায় ফসফেট ও ক্যালশিয়াম বহির্গত হওয়ার কারণ, যা স্বাস্থ্যহানী ও গুরুতর বিপত্তির সৃষ্টি করে। প্রাণী হতে প্রাপ্ত খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিদজাত খাদ্য যেমন চাল, ডাল ইত্যাদিতে এ্যালুমিনিয়াম এর পরিমাণ অনেক বেশী। এ্যান্টাসিড ও কাউলিন জাতীয় অতি ব্যবহৃত ঔষধ ছাড়া থালাবাসন, হাড়ি-পাতিল থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের সময় এ ধাতু নির্গত হয়ে খাদ্য দূষিত করতে পারে। বিশেষ করে পানি সরবরাহ করার পূর্বে ফ্লোরিন মিশিয়ে শোধণ করলে সেই পানি বহুগুণে বেশী এ্যালুমিনিয়ামযুক্ত করতে সক্ষম। আধুনিক জীবনে এমন হাজারো দূষণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আক্রান্ত করছে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলন

ভৌগলিক ও রাজনৈতিক কারণে পৃথিবীকে মানুষ বিভিন্ন দেশে খন্ডিত করলেও পরিবেশেকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। নীল নদের আসওয়াল বাঁধ মিশরবাসী ছাড়াও অন্যান্য নিকটবর্তী দেশ যেমন- সুদান, ইথিওপিয়া, লেবানন, সিরিয়া ইত্যাদি দেশের পরিবেশ ও জনগণকে প্রভাবিত করেছে। হিমালয়ের পাদদেশের বনাঞ্চল ধ্বংস বাংলাদেশের নদ-নদী ভরাট করে বন্যা ও অন্যান্য দূর্যোগের সৃষ্টি করছে। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বনভূমি ধ্বংস এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ গঙ্গার পানি অপসারণ করে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুষ্ক পরিবেশ সৃষ্টি করছে। তাই পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও বৃহৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও ১৯৬০ এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূবিজ্ঞান দিবস, প্রাণবিজ্ঞান কর্মসূচী, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি প্রচারমূলক পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছে- পরবর্তীকালে দেখা গেছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরণের আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ইউনেসকো ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে খরাপীড়িত মরুপ্রায় অঞ্চলের পরিবেশগত দিক সমূহ নিয়ে বেশ তোড়জোড়ে গবেষণা শুরু করে এবং বেশ কিছু সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও করা হয়। কিন্তু অর্থাভাব নির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাব এবং কাঠামোগত দূর্বলতার কারণে কয়েক বছরের মধ্যেই এই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। বর্তমান দুনিয়ার অনেক স্থানে পরিবেশ এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে যে পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা ও কার্যক্রম পূর্ণগতিতে চালানো অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP), ইউনেসকো, (UNESCO), বিশ্ব-বন্যজীব তহবিল (WWA), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP), আইইউসিএন (IUCN), এসক্যাপ (ESCAP) ইত্যাদি অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বর্তমানে পরিবেশ সম্পর্কে প্রচার, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ করছে। তবে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অপুষ্টি দূর না করতে পারলে

সত্যিকার অর্থে পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের যৌথ ও আন্তরিক প্রচেষ্টাই আমাদের একমাত্র গ্রহের পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব হবে।

জাতীয় পরিবেশ আন্দোলন

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সফলতা বহুলাংশে দেশের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় দেশের প্রশাসন ও রাজনীতিবিদগণ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শুধুমাত্র এমন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করেন যারা প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল নন। কোন কোন দেশে পরামর্শ প্রদানের জন্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা রাখার প্রচলন থাকলেও পদার্থ বা রসায়নবিদরাই প্রাধান্য পান; জীববিজ্ঞানী, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রায়ই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী মহলে অবহেলিত ও উপেক্ষিত থেকে গেছে। অন্যদিকে যে কোন ধরণের আধুনিক প্রযুক্তি বা উন্নয়ন পরিকল্পনা, যার পরিবেশগত প্রভাব বা পরিণতি সম্পর্কে জানা নেই, তার অন্ধ অনুকরণ বা বাস্তবায়ন প্রকৃতিকে দূষণ ও ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়। এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বেই পরিবেশ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের নতুন প্রযুক্তি বা উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশগত দিকসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত পরীক্ষণ বজায় রাখা এবং বাস্তবায়ন শেষে নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করা উচিত। এসকল পরীক্ষণের ফলাফলের উপর প্রয়োজনমত পরিকল্পনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, এবং পুনঃবিবেচনা করা উচিত। আমাদের দেশের কর্ণফুলী প্রকল্প, গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প, তিস্তা প্রকল্প, বরেন্দ্র প্রকল্পসহ বহু কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবেশ যাচাই ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টা নেই বলেই এদের পূর্ণ সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে জ্বালানী ক্ষেত্রে বায়োমাস বা উদ্ভিদপ্রাপ্ত উৎসের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করতে পারলে বাংলাদেশে পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

যদিও বর্তমানে স্কুল পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতি ও পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কে পাঠদান শুরু হয়েছে, বিভিন্ন দপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রসারণ কাজ শুরু করেছে, পরিবেশ মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে এবং কতক পত্র-পত্রিকায় পরিবেশ সংক্রান্ত খবরা-খবর বেশী বেশী ছাপা হচ্ছে- আমাদের মত অনুন্নত ও অশিক্ষিত সমাজের জন্য এ সকল প্রচেষ্টা মোটেও যথেষ্ট নয়। দেশের প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তা গ্রামে-শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে হাতে কলমে প্রতিটি নাগরিককে পরিবেশ সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা, পরিবেশ বিনষ্টের কারণ এবং তার প্রতিকার, গাছপালা, বন্যপ্রাণী, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নির্ভরতা, আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থার বিস্তার এবং রাস্তা-ঘাট শহর-গ্রাম স্থাপনের জন্য গাছপালা ধ্বংসের মারাত্মক পরিণতি, পরিবেশ দূষণের ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বংশ লোপ, গ্রীন হাউস এফেক্ট, ওজোনস্তরের ক্ষতি এবং জলাবায়ুর পরিবর্তন, ধ্বংস, খরা ও মরুকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। উন্নত দেশসমূহে গ্রীনপার্টি, রেইনবো গ্রুপ, গ্রীনপিস, ভারতের চিপকো আন্দোলন যেমন শিকড় পর্যায়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনি জনপ্রিয় পরিবেশ প্রতিরক্ষা আন্দোলনই দেশের আপামর জনসাধারণকে পরিবেশ সচেতন করে তুলতে পারে এবং অবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

প্রত্যাশা

পরিবেশের সকল দিক সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং উন্নত ও সুখী জীবন যাপন করতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ ও এর উন্নয়নকল্পে সকল প্রকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্তব্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দরিদ্র, কৃষিপ্রধান ও স্বল্পশিক্ষিত জনসমষ্টিতে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণকারীগণ নিজ দেশের পরিবেশ সম্পর্কে গবেষণা করবেন এবং গবেষণালব্ধ ফল সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ জনগণ পর্যায়ে প্রচার ও ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় আমাদের পূর্ব পুরুষের নিকট থেকে আমরা যে পরিবেশ পেয়েছি, আমাদেরই বংশধর ভবিষ্যত প্রজন্মকে আমরা তা দিয়ে যেতে সক্ষম হব না।

অষ্টাদশ শতাব্দির বিখ্যাত কবি উইলিয়াম ব্লেক একটি ছোট মেয়েকে জন্মদিনের আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে, "সৃষ্টিকর্তা যেন এই পৃথিবী তোমার জন্য এমন সৌন্দর্যময় স্থান করে দেন, যেমনটা আমার জন্য ছিল"। আমরা যারা আজ থেকে মাত্র ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি তারা কি আজকের এই সুন্দর সকালে কোন ছোট শিশুর জন্য কবির মত আশীর্বাদ করে আশা করতে পারি যে সেই আশীর্বাদ বাস্তবে পূরণ করা সম্ভব? আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতি অর্জন করে আমরা ক্রমাগত পৃথিবী পৃষ্ঠকে ক্ষত-বিক্ষত করছি, মাটিকে নিঃস্ব-রিক্ত করছি, বনভূমি ধ্বংস করছি, সমুদ্রের জলরাশী কলুষিত করছি, বায়ুমন্ডল দূষিত করছি, এমনকি মহাশূন্যের পরিবেশ দূষণ এবং ওজোন স্তরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছি, আমাদের দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও ভবিষ্যত চিন্তার এই কি নমুনা? আমরা যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির ধনভান্ডার থেকে ক্রমাগত নিয়েই চলেছি, কিছু কি ফেরৎ দিয়েছি কোন সময়? আমাদের ছেলে-মেয়েদের, ভবিষ্যত বংশধরদের কবি ব্লেকের মত সামান্য আশীর্বাদ করার মুখ আমাদের আছে কি?

প্রাণ সাম্রাজ্যের পাঁচালি নাটিকা

প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র দাস

[স্থান: প্রাণ সাম্রাজ্যের দরবার]

প্রাণসম্রাট : কি আশ্চর্য! আমার দুই রাজ্যে কেন এত গণ্ডগোল?
মেরুদণ্ডী : মহামান্য প্রাণসম্রাট! ঈর্ষান্বিতরা পাকাচ্ছে শোরগোল ॥
প্রাণসম্রাট : কারা তারা? নিশ্চয়ই পিছনে আছে কোনো শিখণ্ডি-
মেরুদণ্ডী : হ্যাঁ, প্রাণসম্রাট, তারা আমারই সখা, অমেরুদণ্ডী ॥
প্রাণসম্রাট : আমার সাম্রাজ্যের দুই রাজ্যে, এ ঝগড়া তো অকারণ-
মেরুদণ্ডী : আমিও তাই বলি, তবুও থামছে না তাদের অতি কথন ॥
প্রাণসম্রাট : কোথায় অমেরুদণ্ডী রাজা? জলদি পাঠাও সমন-

[প্রাণমন্ত্রীর আগমন]

প্রাণমন্ত্রী : শান্ত হন প্রাণসম্রাট, এই তো তার আগমন ॥
প্রাণসম্রাট : বিষয়টি কী? কেন আজ মেরুদণ্ডীদের সাথে ঝগড়া?
অমেরুদণ্ডী : কারণ উনারাই, অতি কৌশলে তুলছেন নানা বাগড়া ॥
মেরুদণ্ডী : শুনলেন সম্রাট, আপনারই সামনে করলো অভিযোগ-
প্রাণসম্রাট : থামুন, তা রাজা অমেরুদণ্ডী- কী আপনার অনুযোগ?
অমেরুদণ্ডী : প্রাণসম্রাট, কয়েকটি দেশের মানুষ গেছে ক্ষেপে-
একপেশে কথা বলছে শুধু, দেখছে না কিছু মেপে ॥
সারাবেলা মেরুদণ্ডীদের নিয়ে, করছে মাতামাতি-
অবহেলায় অনাদরে আমাদের, কাটছে দিবারাতি ॥
আমরা নাকি ছোট প্রাণী, একেবারেই গুরুত্বহীন-
মেরুদণ্ডীদের নিয়ে মানুষ, তাই মত্ত রাতদিন ॥
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের নামে, পাচ্ছে পূজা তারা-
থাকছি আমরা অনুচ্চারিত, অথচ গুরুত্বপূর্ণ যারা ॥
মেরুদণ্ডী : একবার কি দেখেছো ভেবে, কেন এই অবহেলা?
তোমরা অনেকে আড়ালে থাকো, প্রায় সারাবেলা ॥
চেহারা তোমাদের বেশ খারাপ, সেটাও বড় কারণ-
চেনাও বড় কষ্ট তোমাদের, তাই সবাই করে বারণ ॥
অমেরুদণ্ডী ধন্যবাদ মেরুদণ্ডী ভাই, বললে যে কারণগুলো-
সত্যি কি সেসব কারণ, বললে ভাই যেগুলো?
আঁধার কিংবা আড়ালে, তোমারাও থাকো অনেকে-
ইচ্ছে করলেই যায় না দেখা, তোমাদেরও সবাইকে ॥
খারাপই যদি দেখতে মোরা, একেবারেই গরল-
মহামতি হেকেল* কেন- করলেন মোদের নকল?
গহনা আর স্থাপত্যে কেন দিলেন তিনি স্থান?
রং আর নকশায় তোমরা- তুলনামূলক ম্লান ॥
তবে চেনার ব্যাপারে কথাটি- বলেছো প্রায় সঠিক-
চিনতে গেলে আমাদের, শেখা লাগে অনেক দিক ॥
পাশ্চত্যের অনেকে দেশে, আমাদের অনেকে চেনে।
সেসব দেশের অনেক মানুষ, আমাদেরকে জানে ॥
প্রাণসম্রাট : কি আশ্চর্য! রাজা মেরুদণ্ডী, এসব কথা কি সত্যি?
অমেরুদণ্ডী : হ্যাঁ সম্রাট, এর মধ্যে কিন্তু মিথ্যে নেই এক রত্তি ॥

প্রাণসম্রাট : চুপ! রাজা মেরুদণ্ডী, বলুন আপনার নিজের যুক্তি-
এ অবস্থা থেকে- প্রাণ সাম্রাজ্যকে করতে হবে মুক্তি ॥
মেরুদণ্ডী : মহামান্য প্রাণসম্রাট! বিরাট আমাদের আকার-
পুষ্টি আর নানা কাজে মানুষের করি উপকার ॥
সেই কারণে মানুষজন আমাদেরই ভালবাসে-
তাইতো মোদের রক্ষায় তারা- সব সময়ে আসে ॥
এতে অপরাধ কী বুঝি না- মহামান্য প্রাণসম্রাট?
যা সত্যি, তাই বললাম- মন থেকেই অকপট ॥
অমেরুদণ্ডী : ধন্য তুমি, মেরুদণ্ডী রাজা, ধন্য যে তুমি ভাই-
অন্যের গুণাগুণ বলা, তোমার অভিধানে নাই ॥
আকারে তোমরা বিরাট বটে, তবে সংখ্যায় নয়-
জীবজগতের সাতাত্তর ভাগ, আমাদের দিয়েই হয় ॥
জীববৈচিত্র্যের কোন সেবায়, আমরা আছি পিছে?
আমাদের কেন এড়িয়ে যাও, কথা কও শুধু মিছে ॥
আমরাও তো দেই পুষ্টি, খাদ্য হই অনেকে-
তথ্য আছে সন্ধিপদ, কম্বোজের গড়া ঝাঁকে ॥
আমাদেরই কর্মী দ্বারা, ফসলের হয় পরাগায়ন-
আমাদেরই কর্মী দ্বারা, মাটির হয় পুষ্টি সাধন ॥
আমাদেরই কর্মী দ্বারা পরিষ্কার হয় পানি-
জেনেও সেসব মানবে না, তা আমরা জানি ॥
ধ্বংস হলে মোদের রাজ্য, ধ্বংস হবে মানুষ-
একপেশে চিন্তা ফেলে দিয়ে, ফিরুক তাদের হুশ ॥
প্রাণসম্রাট : এ তো মহা সমস্যা! প্রাণমন্ত্রী- আছে কোনো প্রতিকার?
প্রাণমন্ত্রী : আছে সম্রাট। আছে উপায়- প্রথমে ওরা হোক নির্বিকার।
নিবেদন করি, শুনুন প্রাণসম্রাট, উন্নত সব দেশে-
সমাধান তারা করে ফেলেছে, সবাই মিলেমিশে ॥
উন্নতির পথের দেশগুলোও, নিয়েছে নানা পদক্ষেপ-
বাকী কিছু দেশ, বড় উদাসীন, করছেই না ভ্রুক্ষেপ ॥
প্রাণসম্রাট : চলুন তবে, উন্নতি পথের দেশগুলো আগে দেখি-
প্রাণমন্ত্রী : এভাবেই, প্রতিদিনই আমরা অনেক কিছু শিখি ॥

[প্রস্থান]

[উন্নতি পথের কোনো এক দেশের নীতিনির্ধারক কক্ষ]

নিয়ামক : প্রাণিরাজ্যের উন্নতির জন্য, এবার কী আমাদের সংকল্প ?
সহায়ক : বরাবরের মতো, এবারও আমাদের আছে অনেক প্রকল্প ॥
নিয়ামক : অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের জন্য, আমাদের কী কাম্য?
সহায়ক : মেরুদণ্ডী প্রাণিদের সাথে, রাখবো ভারসাম্য ॥
নিয়ামক : অমেরুদণ্ডী প্রাণী, চেনার প্রস্তাব, দিয়েছেন যারা-
সহায়ক : ভারসাম্য আনার জন্য, অগ্রাধিকার পাবেন তারা ॥
নিয়ামক : সংরক্ষণ কাজে, অমেরুদণ্ডীদের দিতে হবে জোর-
সহায়ক : দিয়েছি আমরা, খুলেছি কিন্তু নতুন নতুন দোর ॥
নিয়ামক : বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তন যুদ্ধে, তারাই হবে সৈনিক-
সহায়ক : সত্য বটে, অমেরুদণ্ডীরাই পরীক্ষিত ও নির্ভিক ॥

[প্রাণসম্রাট ও প্রাণমন্ত্রীর আগমন]

প্রাণসম্রাট : ভীষণ ভালো লাগলো আজ, তোমাদের কথোপকথন-
প্রাণমন্ত্রী : প্রকৃতই চিনেছো তোমরা, সত্যিকারের ভালো রতন।

[প্রস্থান]

[স্থান: প্রাণ সাম্রাজ্যের দরবার]

প্রাণমন্ত্রী : দেখলেন সম্রাট, দেশগুলোর নানা পরিকল্পনা?
প্রাণসম্রাট : হু প্রাণমন্ত্রী, ব্যাপারটি নয় নিছক শুধু জল্পনা ॥
প্রাণমন্ত্রী : মেরুদণ্ডী বা অমেরুদণ্ডী, কাউকে করে না প্রত্যাখ্যান-
আন্তরিকভাবে, তৈরি করেছে, তাদের সব পরিসংখ্যান ॥
প্রাণসম্রাট : আগামীর সংকট, মোকাবেলায় নিচ্ছে তারা প্রস্তুতি-
বুঝেছে তারা, এছাড়া তো, সত্যিই নেই অন্য গতি ॥
প্রাণমন্ত্রী : ধেয়ে আসছে খাদ্য সংকট, সংহার মূর্তি নিয়ে-
শতগুণ বৃদ্ধি পাবে, আবহাওয়া পরিবর্তন দিয়ে ॥
প্রাণসম্রাট : বিপুল সেই জনসংখ্যার, খাদ্য ফলবে কোথায়?
বিকল্প খাদ্য খুঁজতে হবে, পাওয়া যাবে যেথায় ॥
প্রাণমন্ত্রী : আসতে হবে প্রাণসাম্রাজ্যে, অমেরুদণ্ডীর খোঁজে-
প্রোটিন চাহিদার অনেকটাই, মেটাতে হবে যে ॥
প্রাণসম্রাট : অমেরুদণ্ডীদের করছে হেলা, চলো এমন দেশে-
প্রশ্ন করবো, গোটা কয়েক, তাদের কাছে হেসে ॥।

[প্রস্থান]

[মেরুদণ্ডীদের নিয়ে ব্যস্ত কোনো এক দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সভা]

প্রাণজীবী ১ : জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, করতে হবে সংরক্ষণ-
তাদের জন্য লড়ে যাব, দেহে প্রাণ থাকে যতক্ষণ ॥
প্রাণজীবী-২ : আমাদের এখানে বাস করতো, বড় বড় সব প্রাণী-
পরিবেশটা ধ্বংসের ফলে, তারা ধ্বংস হলো জানি ॥
প্রাণজীবী-১ : এখনও অনেকে হুমকির মুখে, নিতে হবে ব্যবস্থা-
না হলে যে, তাদেরও ভাগ্যে, হবে একই অবস্থা ॥

[প্রাণসম্রাট ও প্রাণমন্ত্রীর আগমন]

প্রাণসম্রাট : খাসা বলেছেন প্রাণজীবী, আমরাও তাই চাই-
এ বিষয়ে, উত্তর কিছু, দেবেন কি আপনি ভাই?
প্রাণমন্ত্রী : বড় প্রাণীরা হারিয়ে যাচ্ছে, একদম ঠিক যে কথা-
কিন্তু সংবাদ কী ছোটদের, জানেন তাদের ব্যথা?
প্রাণসম্রাট : অমেরুদণ্ডী ক'টা আছে, ক'টা আসলে ছিল?
তাদের মধ্যে কারা তারা- যারা বিদায় নিল?
প্রাণমন্ত্রী : এখন কারা গুণছে প্রহর, অমেরুদণ্ডীর মাঝে ?
বলবেন কি প্রাণজীবী, কী ব্যথা ওদের বাজে?
প্রাণজীবী-১ : তোমরা দেখি শিশুর মতো, প্রশ্ন করছো বৃথা-
কেতাব খুললেই, ওসব হিসেব পেয়ে যাবে যথা ॥
প্রাণজীবী-২ : অমেরুদণ্ডীর পৃথকভাবে, নেই সংরক্ষণের প্রয়োজন -
মেরুদণ্ডীদের ঘিরেই তাই, করি যত আয়োজন ॥
প্রাণসম্রাট : কেতাবের হিসেব মাঠে মেলে না, মাঠের হিসেব কেতাবে-
এমন বিচিত্র ধারার, সংরক্ষণ শেষে, তোমরাই কিন্তু পস্তাবে।

[প্রস্থান]

*আর্নস্ট হেকেল (১৮৩৪-১৯১৯) - জার্মান বায়োলজিস্ট, প্রকৃতিবিদ ও দার্শনিক। অণুজীব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী/উদ্ভিদসহ জীবজগতের অনেক প্রজাতির অঙ্গসংস্থানিক ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '*Art Forms in Nature*' *[Kunstformen der Natur* (1904)] প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এসব ডিজাইন ইউরোপের গহনা শিল্প ও ভবন ও স্থাপনার সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়াম : সাম্প্রতিক অগ্রগতি

ড. আঞ্জুমান আরা আলী
ডেপুটি মিউজিয়াম কিউরেটর

একজন দর্শনার্থী ছাত্র আমাকে প্রশ্ন করেছিলো আপনাদের এত সুন্দর আইডিয়াটা কিভাবে এলো? উত্তরে বলছিলাম প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, অথচ মিউজিয়াম থাকবে না, তা কি হয়? আসল প্রেক্ষাপট হচ্ছে প্রাণিবিদ্যার ছাত্র হিসেবে একজন মিউজিয়ামে বসেই যেন প্রাণী বৈচিত্র্য (animal diversity) পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এতে একদিকে যেমন একজন শিক্ষার্থী তার সিলেবাসকৃত পড়া গুছিয়ে নিতে পারে, পাশাপাশি সেই ছাত্র বিশাল প্রাণীজগৎ ও এর বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করতে পারে। প্রাণিবিদ্যা পঠন-পাঠন ও গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি না সেই বিভাগে একটি মিউজিয়াম থাকে।

প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়াম প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অন্যতম দর্শনীয় একটি কক্ষ (২১৯-কক্ষে ঙ)। কক্ষে ঢোকামাত্রই চোখ-মন শীতল করবে। অন্তর ভরে যেতে বাধ্য এমনই একটি মিউজিয়াম। ১৯৭২ সালে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু মরহুম প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে মিউজিয়ামটি দেশের একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী সংগ্রহশালা। এখানে রয়েছে অনেক দূর্লভ প্রাণীর বিচিত্র সমাহার।

মিউজিয়ামের প্রাণী নমুনাগুলি এই বিভাগের শিক্ষক-ছাত্র ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা সংগৃহীত এবং তারা সেগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করেছেন। তবে কিছু প্রজাতি (species) দেশের বাইরে থেকে আনা হয়েছে। দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ চালু থাকলেও সমৃদ্ধশালী এমন সংগ্রহশালা কোথাও নেই এবং তা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কোথাও অনুসরণ করা হয় না বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের বিভাগীয় মিউজিয়ামে Porifera পর্ব (Phylum) থেকে শুরু করে Chordata পর্ব পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭৩টি প্রজাতির আনুমানিক ১৩৪৪টি নুমনা রয়েছে সংরক্ষিত অবস্থায় (সারণি ১)। এর মধ্যে কিছু পাখি (Aves) ও কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী (Mammalia) stuff করা। বাকী সব ১০-১৫% ফরমালিনে সংরক্ষণ করা। তাছাড়া কিছু কংকালও আছে। আরও আছে Cnidaria পর্বের প্রবাল (coral), যার প্রজাতি সংখ্যা ১৯টি, নমুনা সংখ্যা ৩৩টি এবং বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া, যেগুলি গণ (genus) বা প্রজাতি (species) পর্যায়ে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আরও আছে কিছু শামুকের খোলক (mollucan shell), যার মধ্যে ৪৫টি সনাক্ত করা হয়েছে; কিন্তু কিছু সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। আছে দূর্লভ সংগ্রহ বিভিন্ন প্রজাতির জীবাশ্ম (fossil), যার সংখ্যা ১৪২টি। সংখ্যার দিক দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অবস্থান সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে সর্বমোট ২২২ প্রজাতির মাছ আছে। আমাদের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মিউজিয়ামে সংগৃহীত মিঠাপানির বা স্বাদুপানির ৯৮ প্রজাতির মাছ আছে, যা রাজশাহী ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত। Stuffing করা প্রাণীসমূহের বেশীরভাগই প্রাচীন পদ্ধতিতে করা। তবে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে বিভাগীয় মিউজিয়ামটি এগিয়ে চলেছে। বিশ্বখ্যাত ট্যাক্সিডারমিস্ট (taxidermist) জনাব মার্কো ফিশার (Mr. Marco Fisher, Erfurt, Germany) -এর আন্তরিকতায় আমরা আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছি। তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে বর্তমানে স্টাফকৃত প্রাণীরক্ষেত্রে অধিকাংশই উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে, যাদের সংখ্যা ৮৫টি। পুরাতন পদ্ধতিতে করা ২০৫টি প্রাণীও রয়েছে। সবশেষে আমাদেরই বিভাগের কৃতি ছাত্র ট্যাক্সিডারমিস্ট মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন (রায়হান) এর আন্তরিকতায় সংযোজিত হয়েছে দু'টি সম্পূর্ণ মানব কংকাল (articulated), যার একটি নরের, অন্যটি নারীর।

বর্তমানে আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও আলোক উজ্জ্বল আধুনিক মিউজিয়াম দেখতে পাচ্ছি। অথচ পাঁচ বছর আগেও এমনটি ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মিউজিয়াম 'সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পটি' তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. আব্দুস সোবহান মিউজিয়ামটির গুরুত্ব বিবেচনা করে

অনুমোদন দেন এবং পরবর্তী ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মহাম্মদ মিজানউদ্দীনের সময় এটির কাজ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম, সদস্য প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান ও প্রফেসর ড. এ. এস. এম. শফীকুর রহমান। তিনটি পর্যায়ে প্রকল্পটি বিভক্ত। প্রথম দুটি পর্যায় সম্পন্ন হয় ৪৫,৮০,০০০/= (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয়ে। প্রকল্প বহির্ভূত কিছু উন্নয়ন কাজ হয়েছে এবং তাতে টাকা দিয়ে সহায়তা করেন তৎকালীন বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর ড.এ.এস.এম শফীকুর রহমান, প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র দাস (তার অন্য প্রকল্প থেকে) এবং প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম (প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে)। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ হবে interior decoration, যা এখনও আলোর মুখ দেখতে পায়নি। পুরো প্রকল্পটির সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদারকিতে ছিলেন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের পরিচালক।

সারণি ১ প্রাণিবিদ্যা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বিভিন্ন পর্বের প্রজাতি ও নমুনা সংখ্যা।

পর্ব (Phylum)	মিউজিয়ামের সংরক্ষিত মোট প্রজাতি (species) সংখ্যা	মোট নমুনা (specimen) সংখ্যা
Porifera	০৬	১৫
Cnidaria	১৮	৮০
Platyhelminthes	০৫	০৭
Nematoda	০২	০৫
Annelida	০৭	১৬
Crustacea	২৩	৯৮
Uniramia	২০	৫৪
Mollusca	১৪	৭১
Echinodermata	১০	৩১
Chardata; Sub phylum (i) Urochordata	০৩	০৪
(ii) Cephalochordata	০১	০৩
(iii) Hemichordate	০১	০১
(iv) Vertebrata Classes		
(i) Amphibia	১৭	৩২
(ii) Reptilia	৫০	১০৮
(iii) Pisces	২২২	৬২৮ *
(iv) Aves	৩৬	৯৪
(v) Mammalia	৩৩	৮৯
Minor phyla (i) Acanthocephala	০১	০১
(ii) Priapula	০১	০৩
(iii) Brachiopoda	০১	০২
(iv) Ctenophora	০১	০১
(v) Spurculoidea	০১	০১

* ৬২৮টি নমুনার মধ্যে স্বাদু পানির, সামুদ্রিক পানির, অ্যাকুরিয়ামের এবং exotic মাছ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক

খ

গ

চিত্রঃ ফরমালিনে সনাতন পদ্ধতিতে (ক); স্টাফিং পদ্ধতিতে (খ) এবং অত্যাধুনিক ট্যাক্সিডারমি পদ্ধতিতে (গ) সংরক্ষিত মিউজয়ামের কয়েকটি নমুনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রা.বি।

প্রবাল, বার্ষিক ম্যাগাজিন, ষষ্ঠবিংশ ও সপ্তবিংশ সংখ্যা, ২০১২।
প্রবাল, বার্ষিক ম্যাগাজিন, অষ্টবিংশ সংখ্যা, ২০১৩।

প্রথম বর্ষ (সম্মান) ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের
৪৭তম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিতি

মো. ফিরোজ সরকার
রোল-৯১০৫

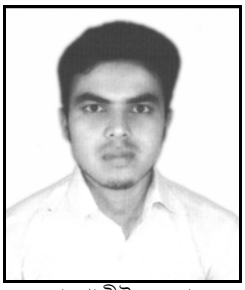
মো. গাজীউর রহমান
রোল-৯১০৬

মো. শাহাজালাল
রোল-৯১০৭

মো. বিপুল হোসেন
রোল-৯১০৮

সিনথিয়া শারমিন ঋতু
রোল-৯১১২

মো. আশাদুল ইসলাম
রোল-৯১১৪

কানিজ খাদিজা
রোল-৯১১৫

নিলুফা ইয়াসমিন
রোল-৯১১৬

মো. ইয়াছির আরাফাত
রোল-৯১১৯

দীপিকা রানী পাল
রোল-৯১২১

মো. মোশারফ হোসেন
রোল-৯১২৩

মো. তারিক আজিজ জীবন
রোল-৯১২৫

মো. আসলাম খান
রোল-৯১২৭

ফারহানা ইয়াসমিন
রোল-৯১২৯

সাকুরা হক
রোল-৯১৩৮

মো. তারেক মন্ডল
রোল-৯১৩৯

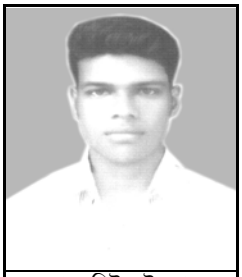
মো. রবিউল ইসলাম
রোল-৯১৪০

মোজাম্মেল হক
রোল-৯১৪৪

সৌমিত্র সাহা
রোল-৯১৪৭

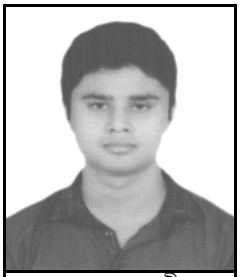
মো. রায়হান শরীফ
রোল-৯১৫৫

মো. মনিরুল ইসলাম
রোল-৯১৫৯

মো. মোমিনুল ইসলাম
রোল-৯১৬০

মো. আব্দুর রহিম
রোল-৯১৬৩

মিল্টন কুমার
রোল-৯১৬৪

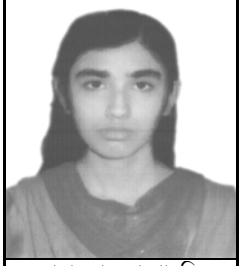
মোছা. রাবেয়া শারমিন
রোল-৯১৬৬

মো. রবিউল ইসলাম
রোল-৯১৬৭

মো. রাজু হাসান
রোল-৯১৬৮

রতন হেম্ব্রম
রোল-৯১৭১

মো. তরিকুল ইসলাম
রোল-৯১৭২

মো. বাবু আক্তার
রোল-৯১০৫ পুনঃভর্তি

তৌফিকা আশরাফী
রোল-৯১৩১ পুনঃভর্তি

মো. শাহিন আলম
রোল-৯১৩৮ পুনঃভর্তি

মোছা. শারমিন সুলতানা
রোল-৯১৪১ পুনঃভর্তি

প্রদীপ্ত কুমার
রোল-৯১৫৮ পুনঃভর্তি

তন্ময় সরকার
রোল-৯১৭৯ পুনঃভর্তি

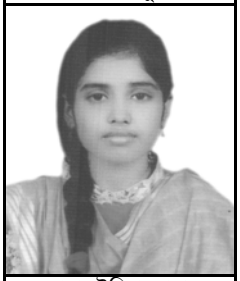
মোছা. ইরিনা জাহান
রোল-৯১৯১ পুনঃভর্তি